অঙ্গরাগ

প্রবোধকুমার সান্যাল

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

দাম—দুই টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

বৈশাখ—১৩৫২

এই বইয়ের কাগজ সংগ্রহে সহায়তা করেছেন বেঙ্গল পেপার মিলসের শ্রীপ্রতাপ কুমার সিংহ, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, দি মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিঃ,
[illegible]

তৃতীয়া

প্রথম বিবাহ যখন হয় তখন প্রথম যৌবনের সমারোহ। প্রণবেশের জীবনে সেদিন নবীন বসন্তের আবির্ভাব। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন, আনন্দ-উল্লাস—ইহাদেরই ভিতর দিয়া সে সুন্দরী শিক্ষিতা বধূ ঘরে আনিয়াছিল। সংসার ছিল আনন্দের হাট।

তারপর একদিন আকাশের চেহারা বদ্‌লাইল, দিক্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন করিয়া কালবৈশাখী নামিয়া আসিল। গুরু গুরু মেঘের গর্জ্জন, দিক্‌ চিহ্নহীন অন্ধকার, শিলাবৃষ্টি, তারপর বজ্রাঘাত। শাঁখা ও সিঁদুর পরিয়া প্রণবেশের প্রথম স্ত্রী বিদায় লইল।

তাহার পর দ্বিতীয় স্ত্রী। ঘা শুকাইয়াছে, কিন্তু দাগ তখনও মিলায় নাই। তবু প্রণবেশ ঘর বাঁধিল, ফাটলগুলি মেরামত করিল, চুনকাম করিল, জানালা দরজা খুলিয়া আলো-বাতাসের পথ করিয়া দিল। দ্বিতীয় স্ত্রীর মধ্যে প্রথমাকে সে আবিষ্কার করিয়া লইল।

স্ত্রী যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী নয়। এক বৎসর কায়ক্লেশে ঘর করিয়া অবশেষে সে শয্যাগ্রহণ করিল। শয্যা সমেতই প্রণবেশ একদিন তাহাকে ট্রেনে করিয়া বাপের বাড়ি লইয়া গেল। ফিরিবার সময় দেখা গেল, স্ত্রী তাহার সঙ্গে নাই—প্রণবেশ একা; অশ্রুসিক্ত তাহার মুখ।

সেই হইতে কয়েক মাস সে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাইয়াছে। সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও সদ্বংশের সন্তান—জীবনে সে অন্যায় করে নাই,

জীবন-বিধাতাকে সে কোনোদিন অপমানও করে নাই! তবু সে পথে-পথে ঘুরিয়াছে, অসহ্য লজ্জায় সে সমাজ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে, রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে।

জীবনের প্রতি তাহার গোপন মমতা ও ভালবাসা মৃত্যুর মধ্য দিয়া একটু একটু করিয়া বাড়িয়াছে, কিন্তু সে আর কাহাকেও বিশ্বাস করে না। মানুষ তাহার কাছে অসহায়, ক্ষুদ্র অবস্থার দাস,—নিয়তির খেয়ালের খেলনা।

*

* *

তারপর তৃতীয়া।

বিবাহ-বাড়ির গোলমাল চুকিয়াছে, একে একে সব আলোগুলি নিবিয়া গেল। এ বিবাহে আনন্দের চেয়ে স্বস্তিই যেন বেশী। উত্তেজনা নাই, একটি মন্থর ক্লান্তির ভাব।

ফুলশয্যার রাত। আলোটা একধারে টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলিতেছে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে নিবিয়াও যাইতে পারে। ঘরের বাহিরে আড়ি পাতিবার মতো মানুষ কেহ নাই। না আছে কাহারও ধৈর্য্য, না অভিরুচি।

ঘরের উত্তর দিকে দাঁড়াইয়া প্রণবেশ জানালার বাহিরে শুক্লা রাত্রির দিকে তাকাইয়া ছিল, ঘরের দক্ষিণ দিকে দরজার কাছে সুললিতা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া। দেখিলে মনে হয় একজনের কথা ফুরাইয়া গেছে, আর একজনের কথা আরম্ভ করিবার পথ নাই।

ঘরের মাঝখানে খাটের উপর শয্যা রচনা করা ছিল, সুললিতা এক সময় উঠিয়া আসিয়া একপাশে শুইয়া পড়িল। বিছানায় শুইয়া জাগিয়া থাকিবার অভ্যাস সে করে নাই, সে ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে

লাগিল। প্রণবেশ তাহার দিকে একবার তাকাইল, তারপর অত্যন্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে দূর হইতেই বলিল,—চোখে লাগছে, আলোটা নিবিয়ে দেবো ?

—সুললিতা স্পষ্ট কণ্ঠে কহিল,—না।

এমন সহজ ও পরিচ্ছন্ন গলার আওয়াজ প্রণবেশ জীবনে শোনে নাই। সে চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, প্রণবেশ ক্লান্ত হইয়া জানালার কাছ হইতে সরিয়া আসিল, খাটের কাছাকাছি আসিয়া কহিল,—সারাদিন উপবাসে গেল, কত কষ্ট হয়েছে, কিছু খেলে হ'ত না ?

সুললিতা মুখ তুলিয়া সামান্য একটুখানি হাসিল, তারপর কহিল,—একদিন না খেলেও মানুষ বেঁচে থাকে।—বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিল।

কুণ্ঠায় ও সঙ্কোচে প্রণবেশ ধীরে ধীরে খাটের নিকট হইতে সরিয়া গেল।

সকাল বেলা উঠিয়া যে যার কাজে নামিল, বেলা বাড়িল, কিন্তু নূতন বউ আর উঠিতে চায় না। পিসিমা একবার মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া গেলেন, বউ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। প্রণবেশ বাহির হইয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া অপ্রস্তুত হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইল—কিন্তু সুললিতা আর জাগে না।

প্রণবেশ এক সময় ঘরে ঢুকিয়া অতি সন্তর্পণে বার-দুই ডাকিল। চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া সুললিতা কহিল,—কেন ?

নূতন বধূর মুখের সহিত সে-মুখের চেহারা মেলে না, প্রণবেশ অপ্রস্তুত হইয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, পরে কহিল --এমনি ডাকছি, এ-ক'দিন বোধ হয় তুমি ঘুমোতেই পাওনি !

—তা জেনেও আবার ডাকা হ'ল কেন ?---বলিয়া গম্ভীর হইয়া

সুললিতা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। মনে হইল ঘুম ভাঙাইলে সে অকারণে চটিয়া যায়।

এই মেয়েটির দিকে অগ্রসর হইতে কোথায় যেন একটি ভয়ানক বাধা আছে। প্রণবেশের ধারণা হইল সে-পথ ভয়ানক দুর্গম, অতিরিক্ত কণ্টকাকীর্ণ। নারী কেমন করিয়া নিঃশ্বাস ফেলে তা পর্য্যন্ত প্রণবেশের জানিতে আর বাকি নাই।

কাপড় কাচিয়া সুললিতা ঘরে ঢুকিতেই প্রণবেশ বাহির হইয়া গেল। পিসিমা জলখাবার লইয়া আসিলেন! মনে হইল, সুললিতা যেন তাঁহাকে দেখিতেই পায় নাই; পিছন ফিরিয়া সে চুল আঁচড়াইতে লাগিল।

—বউমা ?

সুললিতা ফিরিয়া তাকাইল, তারপর কহিল,—রাখুন না ওইখানে, আমি এখন মাথা আঁচড়াচ্ছি।

পিসিমা কহিলেন,—মুখখানি তোমার শুকিয়ে আছে, আগেই খেয়ে নাও মা।

—না, পরে খাবো। আপনি রাখুন ওইখানে।

পিসিমা কহিলেন,—আচ্ছা আচ্ছা, তাই খেয়ো মা, এই রইল জল, পরেই খেয়ো, আমি ভাবছিলাম—বলিতে বলিতে তিনি সস্নেহ হাসি হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পরিবারের মধ্যে অনেকেই ছিল, কিন্তু তাহারা কেহই নব-পরিণীতা বধূর ভাবগতিক বুঝিতে না পারিয়া পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। অথচ বলিবার এবং অভিযোগ করিবার কেই-বা আছে! মৃত্যু ও বেদনার মধ্য দিয়া এই মেয়েটি সকলের মধ্যে আসিয়াছে, ইহাকে নির্ব্বিচারে যত্ন করিতে হইবে, ভালবাসিতে হইবে, ইহার দাবি, স্বাধীন ইচ্ছা এবং অবাধ অধিকার সকলকে মাথা

পাতিয়া লইতে হইবে। এই মেয়েটিকে সম্ভ্রম করিতে সকলেই বাধ্য।

কয়েকদিন পরে একদিন সুললিতা বলিল,—আচ্ছা এটা ত আমাদেরই ঘর?

প্রণবেশ সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল,—হ্যাঁ, কি হ'ল? কেন বল ত?

—ভাঙা বাক্স আর বিছানাগুলো কা'র?

—ওঃ ওগুলো পিসিমার,—আজ ক'দিন থেকেই—

সুললিতা কহিল,—সরিয়ে নিয়ে যান্ উনি, শোবার ঘরের মধ্যে ওসব ছাই-পাঁশ আমি সইতে পারিনে। এখনি নিয়ে যেতে ব'লে দাও। বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সে আবার ঘুরিয়া আসিয়া অলক্ষ্য কাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিল,—এত ভিড়ই বা এ বাড়ীতে কেন? কাজকর্ম্ম কবে চুকে গেছে, এবার সবাই আমাকে নিশ্বেস ফেলতে দিক বাপু।—এই বলিয়া সে সম্রাজ্ঞীর মতো উন্নত মস্তক লইয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

প্রণবেশ মুখ ফিরাইয়া এবার উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্বিধা-কুণ্ঠিত নিজের মুখখানা নিজেই অনুভব করিয়া সে একবার কোথাও নির্জ্জনে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু যে শাসন সুললিতা এইমাত্র করিয়া গেল, তাহা না মানিয়া লইবারও কোনো উপায় নাই। বিপন্নের মতো প্রণবেশ ভাঁড়ার-ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল।

—পিসিমা?—দরজার পাশ হইতে সে ডাকিল।

পিসিমাও তাহাকে ডাকিলেন না, শুধু ভিতর হইতে বলিলেন, —কেন বাবা? কিছু বল্‌বি?

—বলছিলাম যে—বলিয়া প্রণবেশ একবার এদিক ওদিক তাকাইল, তারপর কোনো রকমে কথাটা বলিয়াই ফেলিল,—তোমরা কি কালকেই যাওয়া ঠিক করলে পিসিমা?

—কাল ত নয় বাবা, আজই—কথাগুলি ছাড়াও আর একটি শব্দ পিসিমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, সম্ভবতঃ সেটি তাঁহার তীক্ষ্ণ হাসির একটি শিখা।

প্রণবেশ কহিল,—আজকেই?

—হ্যাঁ বাবা, আজকেই। সেখানে সংসার ফেলে এসেছি, না গেলে আর চলছে না। আমি গাড়ী ডাকতে পাঠিয়েছি বাবা।

গাড়ী আসিল। ছেলেপুলে সঙ্গে করিয়া পিসিমা বিদায় লইলেন। ইতিমধ্যে আর সকলেই চলিয়া গিয়াছিল। বাকি ছিলেন ছোট মাসিমা, একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে লইয়া রাত্রের গাড়ীতে তিনি সেদিন কাশী রওনা হইলেন।

নারীর গোপন আত্মপরতা প্রণবেশের চোখ এড়ায় না, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল। অনাদর করিয়া সে ভুল করিবে না, অশ্রদ্ধা করিয়া সে অশান্তি আনিবে না,—চুপ করিয়া তাহাকে থাকিতেই হইবে। সুললিতাকে আগে তাহার রহস্যময়ী মনে হইয়াছিল, এখন দেখিল তাহা নয়, সে অতিরিক্ত স্পষ্ট, তাহাকে বুঝিবার জন্য চোখ খুলিয়া থাকিলেই হয়, পরিশ্রম করিতে হয় না।

তবু তৃপ্তি! মরুভূমির ভয়াবহতা কেমন, এ কথা প্রণবেশের চেয়ে আর কে বেশী জানে! তাই সে তৃপ্তি পাইয়াছে শ্যামলতার আস্বাদ পাইয়া। চক্ষু আর তাহার জ্বালা করে না, বরং একটি অলসতার আবেশে ভারী হইয়া আসে।

রাস্তায় বেড়াইয়া ঘুরিয়া আপন মনে টহল দিয়া বাড়ি ফিরিতে তাহার একটু রাতই হয়। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়া সে পা টিপিয়া টিপিয়া সেদিন ঘরে ঢুকিল। ভাবিল, সুললিতাকে একটু চমকাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু কৌতুক করা আর তাহার হইয়া উঠিল

না। জানালার ধারে সুললিতা বসিয়াছিল, মুখ ফিরাইয়া একবার তাহাকে দেখিল। তাহার উদাসীন মুখ দেখিয়া প্রণবেশের মুখের হাসি ধীরে ধীরে স্থির হইয়া আসিল, কোথায় যেন কি একটা খচ্ খচ্ করিয়া উঠিল।

জানালার ধার হইতে সুললিতা উঠিয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। ক্ষানিকক্ষণ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল এবং সেই অবস্থাতেই এক সময় জিজ্ঞাসা করিল,—চিঠিখানা ফেলা হয়েছিল ?

প্রণবেশের চমক ভাঙিল। বলিল,—ওই যা ভুলে গেছি, পকেটেই রয়ে গেছে। কাল সকালে উঠেই—

উত্যক্ত কণ্ঠে সুললিতা বলিয়া উঠিল,—কাল সকালে, কিন্তু আজ ত আর ফেলা হ'ল না ? কই, দাও আমার চিঠি, আমি ঝি-কে দিয়ে ফেলতে পাঠাবো।

প্রণবেশ নিঃশব্দে চিঠি বাহির করিয়া দিল। হাতে লইয়া সুললিতা কহিল,—খুলেছিলে ত ? নিশ্চয় খুলেছিলে !

—আমি ত অন্যের চিঠি খুলি না ?

—সত্যি বলছ ?

প্রণবেশের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, মাথা হেঁট করিয়া কহিল, —হ্যাঁ।

সুললিতা একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া অতি যত্নে চিঠিখানি নিজের মাথার বালিশের তলায় রাখিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

রাত জাগিয়া প্রণবেশের পড়াশুনা করা অভ্যাস। টেবিলের উপর আলোটা ঠিক করিয়া লইয়া সে চেয়ার টানিয়া বসিল। এই পড়াশুনা অনেক দিনের অনেক অবস্থা হইতে তাহাকে মুক্তি দিয়াছে।

এমন সময় জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি খেয়েছ সুললিতা ?

সুললিতা তাহার এ কথার জবাব দিল না, বাঁ-হাত বাড়াইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কেবল কহিল,—খাবার ঢাকা আছে ও-কোণে, খেয়ো।

আর কেহ কোনো কথা কহিল না। শুধু টেবিলের উপর টাইম-পিস ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিয়া শব্দ করিতে লাগিল।

একখানি বই মুখের কাছে খুলিয়া প্রণবেশ কি করিতেছে তাহা সে নিজেই জানে না। হয়ত বইয়ের অক্ষরগুলির দিকে তাকাইয়া সে ভাবিতেছিল, এমনি করিয়াই তাহার প্রত্যেকটি দিন প্রত্যেকটি রাত কাটিবে। আলো জ্বলিতেই লাগিল, কিন্তু বই হইতে সে মুখ তুলিল না, হাত পা নাড়িল না, চোখের পলক ফেলিল না।

সুললিতা একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিল, তারপর কহিল,—ও বাড়ির মেজবৌটা আজ এসেছিল আমার কাছে···ছুঁড়ির কি অংখার গো, ও সব সাপের হাঁচি আমি চিন্‌তে পারি···আ-মর্! দিলাম আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে। আমি কারও তক্কা রাখিনে।

প্রণবেশ একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু কিছু বলিল না। শুধু তাহার সত্যবাদী মন বলিয়া উঠিল, এ মেয়েটির অন্তরে আভিজাত্যও নাই, ঐশ্বর্য্যও নাই!

স্বামীর নিকট হইতে কোনো উত্তর এবং সমর্থন না পাইয়া সুললিতা একবার ভ্রূকুঞ্চন করিল, তারপর গুছাইয়া পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিল।

অনেকক্ষণ পরে প্রণবেশ উঠিল। ঘরের এক কোণে খাবার ঢাকা ছিল, সরিয়া গিয়া খাবারের ঢাকা খুলিল, কিন্তু কি জানি, আহার করিবার তাহার রুচি ছিল না—সে আবার উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। অভিমান সে করিতে পারে কিন্তু করিবে কাহার উপর?

বাহিরে অনেকক্ষণ পায়চারি করিয়া সে আবার আসিয়া ঘরে

ঢুকিল। আলোতে বোধ করি তেল ছিল না, ধীরে ধীরে নিবিয়া আসিতেছে। জানালার বাহির হইতে চাঁদের আলো স্পষ্ট হইয়া বিছানার উপর আসিয়া লাগিয়াছে। খাটের কাছে গিয়া প্রণবেশ দাঁড়াইল। সুললিতা এবার সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। প্রণবেশের মনে হইল ঘুমাইলে তাহার মনের মালিন্য মুখের উপর ফুটিয়া উঠে না। মুখ তাহার সত্যিই সুন্দর। জানালাটা প্রণবেশ সবখানি খুলিয়া দিল। বাতাস আসিতেছিল না, হাত-পাখাখানি লইয়া সে সুললিতার মাথার কাছে বাতাস করিতে লাগিল। অনেক দুঃখ ও ও অনেক গ্লানির ভিতর দিয়া এই মেয়েটিকে সে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে, ইহার উপর কোনোদিন কোনো মুহূর্তেই অভিমান করা চলিতে পারে না।

ভালবাসিয়া সে দুঃখ পাইয়াছে, এই মেয়েটিকে সে আর ভাল-বাসিবে না। প্রেম তাহার জীবনে মৃত্যুর পর মৃত্যু আনিয়াছে, অভিশাপ আনিয়াছে, কাঙালের মতো তাহাকে পথে পথে ঘুরাইয়াছে। —স্ত্রী তাহার বাঁচে না বলিয়া আত্মীয়জন ও বন্ধুবান্ধবের কঠোর ইঙ্গিত সে সহ্য করিয়াছে,—ভাল আর সে বাসিবে না। স্ত্রীর সহিত তাহার এবারের সম্পর্ক হইবে প্রেমের নয়—মমতা, দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতির।

অনেকক্ষণ ধরিয়া বাতাস করিয়া প্রণবেশ খাটের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। আলোটা ইতিমধ্যে নিবিয়া গিয়াছে।

সংসারের কিছু কাজ না করিয়া সুললিতার উপায় নাই, নিতান্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। অথচ তাহাকে ছুটিয়া হাঁটিয়া চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে দেখিলে প্রণবেশ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। সতর্ক

পাহারায় সমস্ত আঘাত হইতে সে তাহার স্ত্রীকে সাবধান করিয়া রাখিতে চাহে।

—কিন্তু তুমি উনুনের কাছে গিয়ে যেন বসো না সুললিতা।

—কেন?

—দরকার কি? যে চঞ্চল তুমি, কোন্ সময় যদি আঁচল ধরে যায়?

সুললিতা হাসিতে লাগিল, তারপর কহিল,—এ যে জেলের শাস্তি! উনুনের কাছে যাব না পাছে আঁচল ধরে যায়, কুটনো কুটতে বসবো না পাছে হাত কাটে, জল তুলতে যাবো না পাছে পা পিছ্‌লে পড়ে যাই,—সে দিন আর একটা কি বলছিলে? হ্যাঁ মনে পড়েছে, ছাতে বেড়াতে পারব না পাছে ঘূর্ণী হাওয়ায় ঘুরে পড়ে যাই! তাহ'লে কি করব বল ত সারাদিন?

বিদ্রূপ সুললিতা করিতে পারে, করিলে অন্যায়ও না, কিন্তু প্রণবেশ ত জানে জীবনের অর্থ কি! একটি বিশেষ দৈব ঘটনার জন্য মানুষ বসিয়া আছে, কখন্ কেমন করিয়া কিরূপে সে-দৈব নিয়তির মতো মানুষের উপর আসিয়া পড়িবে তাহার কোনো স্থিরতাই নাই।

কিয়ৎক্ষণ সে চুপ করিয়া রহিল, তারপর কহিল,—বেড়াতে যাবে আমার সঙ্গে?

সুললিতা কহিল,—কি ভাগ্যি!

প্রণবেশ বলিল,—প্রতাপবাবুর বাড়ীতে কীর্ত্তন আছে, চল আজ শুনে আসি।

সন্ধ্যার সময় সেদিন তাহারা দুইজনে সত্যই বাহির হইল। কাঁসারীপাড়ায় কোথায় কীর্ত্তন হইতেছে, সেইখানে গাড়ী করিয়া তাহারা আসিল। বাল্যকাল হইতে প্রণবেশের কীর্ত্তন শুনিবার সখ।

ভিতরে কীর্ত্তন বসিয়াছে, কথক ঠাকুর 'দোয়ার' সঙ্গে লইয়া আসরের মাঝখানে বসিয়াছেন। পালা মাথুরের। শ্রীকৃষ্ণের

মথুরাযাত্রার সময় শোকার্ত্ত ব্রজবাসীর করুণ বিলাপ সুরু হইয়াছে। উদ্ধব আনিয়াছে সংবাদ, অক্রুর আনিয়াছে রথ। আসন্ন প্রিয়বিরহে বিবশা ব্যাকুল শ্রীমতী ধূলায় ধূসরিতা। কথক ঠাকুর মধুর কণ্ঠে ও সুললিত ভাষায় সমস্ত বর্ণনা করিতেছেন।

নিস্তব্ধ আসরে সকলেই উদ্বেলিত অশ্রুতে কীর্ত্তন শুনিতেছিল। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ সকলেই সেই সুন্দর কথকতায় মুগ্ধ হইয়া মাঝে মাঝে চোখের জল মুছিতেছিল।

প্রণবেশের নিঃশ্বাসও ভারী হইয়া আসিয়াছিল, তাহার মন বড় নরম। অনেকক্ষণ এমনি করিয়া শুনিতে শুনিতে এক সময় পিঠে চাপ পড়িতেই সে ফিরিয়া তাকাইল। একটী ছোট ছেলে তাহাকে ডাকিতেছিল। ছেলেটি তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া দরজার দিকে দেখাইয়া কহিল,—আপনাকে ডাকছেন।

প্রণবেশ কহিল,—কে?

—ওই যে, উঠে আসুন না?

শ্রোতাদের ভিতর হইতে অতি কষ্টে পথ কাটিয়া প্রণবেশ উঠিয়া আসিল। আসিয়া দেখে, দরজার কাছে সুললিতা দাঁড়াইয়া। মুখে কাপড় চাপা দিয়া কোনও রকমে সে তখন হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছিল।

প্রণবেশকে দেখিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া সে বলিল,—কি জায়গাতেই এনেছিলে বাপু, হাস্‌তে হাস্‌তে আমার দম আট্‌কে যাচ্ছিল। যে-দিকেই তাকাই, সবাই ফোঁস্ ফোঁস্ করছে। কাঁদবার জন্যে এরা সবাই তৈরী হয়ে এসেছিল!

আবার সে হাসিতে লাগিল।

প্রণবেশের চোখে তখনও জলের রেখা মিলায় নাই। সে শুধু নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আর একটু শুনে গেলে হ'ত না?

—না, আর এক মিনিটও নয়, এখুনি চল। মানুষের কান্না শোনবার জন্যে ত' আর বেড়াতে বেরুনো হয়নি!

অগত্যা প্রণবেশ তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া আসিল। ফুট্‌পাথের উপর এক জায়গায় সুললিতাকে দাঁড় করাইয়া সে গাড়ী ডাকিতে গেল। পথের অন্ধকারে তাহার মুখের চেহারাটা কি রকম হইয়াছিল তাহা বুঝা গেল না। কীর্ত্তন শেষ হইবার আগেই তাহাকে উঠিয়া আসিতে হইয়াছে এজন্য সে দুঃখিত নয়, কিন্তু তাহার মনে হইতেছিল, সুললিতার অকরুণ ও হৃদয়হীন হাসিটা তখনও তাহার মনের মধ্যে আগুনের ঢেলার মতো নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে। বিয়োগান্ত ভালবাসা যে-নারীর মনে রেখাপাত করে না, করুণ রস যাহার নিকট নিতান্তই বিদ্রূপের বস্তু, হৃদয়ের কোমল বৃত্তির পরিচয় যাহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও নাই—সে নারীর বোঝা চিরদিন সে বহিবে কেমন করিয়া? ভয়ে প্রণবেশের বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল।

গাড়ীতে বসিয়া কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতেছিল না, কেবল এক একবার সুললিতা কীর্ত্তনের আসরের দৃশ্য স্মরণ করিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিতে লাগিল।

সে-রাত্রে প্রণবেশ স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতে পারে নাই।

বাড়ীতে অনেক দিন হইতে তাহাদের কয়েকটি পাখী পোষা ছিল। নীচে ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখে ময়নাপাখীর একটা বড় খাঁচা অনেক দিন হইতেই এ বাড়ীতে রহিয়াছে। পাখীগুলি প্রণবেশের আদরের। সুললিতা ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের নিয়মিত আহার পরিবেশন করিবার ভার লইয়াছিল।

সে-দিন উদ্বিগ্ন হইয়া আসিয়া প্রণবেশ কহিল,—ইস্, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে, পাখীগুলোর কি অবস্থা হয়েছে দেখেছ সুললিতা?

সুললিতা একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর একটুখানি অপ্রতিভ হইয়া কহিল,—ওঃ, ওদের ক'দিন খাবার দেওয়া হয়নি বটে। চল যাচ্ছি।—বলিয়া সে নিতান্ত উদাসীনের মতো বিছানা গুছাইয়া খাবার লইয়া নীচে নামিয়া আসিল। আসিয়া দেখে, দুই তিন দিন অনাহার সহিতে না পারিয়া পাঁচ ছয়টি পাখী ইতি-মধ্যেই মরিয়া গিয়াছে, বাকী কয়েকটি ধুঁকিতেছে।

প্রণবেশ তাহার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া ধীরে ধীরে একটা বড় নিঃশ্বাস শুধু ফেলিল, কথা কহিল না।

সুললিতা বলিল,—বাবারে, কী ক্ষীণজীবী এরা! দু-দিন খাবার দিতে মনে নেই তা'তেই একেবারে বংশলোপ! ধন্য!

প্রণবেশ তবুও কথা কহিতেছে না দেখিয়া সে বলিল,—এত শিগ্‌গির যখন এরা নষ্ট হয় তখন এদের দাম অল্পই। কাল দুটো-টাকা দেবো, গোটাকয়েক পাখী আমায় এনে দিয়ো।

প্রণবেশ চুপ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

এমনি করিয়াই তাহাদের দিন চলিয়াছিল।

স্বার্থান্ধতার স্পষ্ট রূপ দেখিয়া প্রণবেশ শিহরিয়া উঠিয়াছে, মনের দৈন্য ও দারিদ্র্যের ভয়াবহ পরিচয় পাইয়া ভিতরে ভিতরে তাহার অসহ্য হইয়াছে, অসঙ্গত দাবি ও অনধিকার মন্তব্য শুনিয়া সে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিয়াছে,—কিন্তু ফাটিয়া পড়িবার সাধ্য তাহার ছিল না। নিষ্ঠুরতা ও কাঠিন্য তাহাকে প্রতিদিন যন্ত্রণা দিতেছিল, কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা সে হারাইয়া ফেলিয়াছে, মার্জ্জনা তাহাকে করিতেই হইবে!

এমনি করিয়াই তাহাদের দিন চলিতেছিল।

শরৎকালের ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময়টায় সুললিতার একদিন গা গরম হইল। অতিরিক্ত জল ঘাঁটা তাহার অভ্যাস, তাই ঠাণ্ডা

লাগিয়া গিয়াছে। সারাদিন সে কিছু খাইল না, শুইয়া বসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দিন তিনেক পরে সে আর লুকাইতে পারিল না, গা তাহার পুড়িয়া যাইতেছে। মুখ চোখ লাল হইয়াছে, গা ভারী, মাথা তুলিতে পারিতেছে না। ধীরে ধীরে আসিয়া সে বিছানা লইল। বিছানায় শুইয়া সে চোখ বুজিল।

প্রণবেশ তাহার দিকে চাহিয়া এক সময় একটু হাসিল। সে-হাসি সুললিতা দেখিতে পাইল না, পাইলে বুঝিত এ-হাসির সহিত পরিচয় তাহার অতি অল্প। কাছে আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া প্রণবেশ দেখিল, ভয়ানক গরম। তারপর কহিল,—নিশ্চয় তোমার বুকেও সর্দ্দি বসেছে, নয়? গলাটা ঘড়-ঘড় করছে ত? সে ত করবেই, আমি জান্‌তাম!

সুললিতা রাগ করিয়া কহিল,—বুকে আমার সর্দ্দি বসেনি!

—বসেনি? আশ্চর্য্য!—বলিয়া প্রণবেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর আবার একটু হাসিয়া গায়ে জামা ও পায়ে জুতা দিয়া সে ডাক্তার ডাকিতে গেল।

ডাক্তার তাহার পরিচিত। দেখা করিয়া সে কহিল,—আর একবার এলাম আপনার কাছে, ডাক্তারবাবু!—এই বলিয়া সে হাসিয়া একেবারে আকুল হইল।

ডাক্তার কহিলেন,—কি হ'ল?

—প্রথমে যা হয়, জ্বর; তারপর যা হয়, সর্দ্দি; সর্দ্দির পর যা হয় তা আপনি জানেন! জ্বর বোধ হয় এখন দু-তিন ডিগ্রি, পাঁচ ডিগ্রিও হ'তে পারে! কোনো ভুল হয়নি ডাক্তারবাবু, ঠিক পথেই চল্‌ছে!

ডাক্তার কাছে আসিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন,—অত ভয় কিসের, জ্বর বই ত কিছু নয়। চলুন।

মোটরে করিয়া ডাক্তারবাবু আসিলেন।

রোগী দেখিয়া তিনি খানিকক্ষণ গম্ভীর হইয়া রহিলেন, মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলেন না। মনে হইল তিনি যাহা ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলেন তাহা নয়। এ জ্বর অন্য জাতের। এ জ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, সামান্য সেবায় ইহা শান্ত হয় না।

ঔষধ লিখিয়া তিনি যখন উপদেশ দিতে দিতে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন প্রণবেশ বলিল,—রোগটা শক্ত হলেও বেঁচে যাবে, কি বলেন?

কণ্ঠস্বর শুনিয়া ডাক্তারবাবু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে তাকাইলেন, তারপর কহিলেন,- ভাল ক'রে দেখাশুনো করবেন, এমন আর কি ভয়ের কারণ আছে!

ভয়ের কারণ থাকিলে ভাল হইত কিনা তাহা প্রণবেশ একবার চিন্তা করিয়া দেখিল। তারপর কহিল,—বুঝলেন ডাক্তারবাবু, আপনি-ত সবই জানেন আমার, এবার আমি বিয়ে ক'রে অন্যায়ই করেছি, না করলেই পারতাম। আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার চুপ করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইলেন, তারপর চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—একটু চোখে চোখে রাখলেই সেরে যাবে, এমন কিছু কঠিন রোগ নয়!

—নয়?—প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করিল।

—বিশেষ না!

ডাক্তার যখন চলিয়া গেলেন, তখন রাত হইয়াছে। প্রণবেশ ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সুললিতা জ্বরে অচেতন হইয়া চোখ বুজিয়া আছে। প্রণবেশ নিঃশব্দে তাহার মাথার কাছে আসিয়া বসিল। মাথার মধ্যে তখন তাহার ঝড় বহিতেছিল।

এই নারীটির সেবা করিয়া, যত্ন করিয়া ইহাকে ঔষধপত্র খাওয়াইয়া

বাঁচাইয়া তুলিতেই হইবে। মৃত্যু আর সে চাহে না, সে জীবন ভিক্ষা করিতে চাহে। এই নারীটির চরিত্রে শত দৈন্য ও শত অন্যায়ের সন্ধান সে পাইয়াছে, এই নারী বাঁচিয়া থাকিলে তাহার সমস্ত জীবন দুর্ব্বিসহ বোধ হইবে, প্রতিটি দিন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া উঠিবে, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার মন ক্লেদাক্ত হইয়া উঠিতে থাকিবে—তবু সে বিধাতার কাছে ইহার জীবন ভিক্ষা চাহে। চিরদিনের অশান্তির অসহ্য বেদনায় তাহার বুক ভাঙিয়া যাক্—তবু সে সুললিতার মৃত্যুকামনা করে না। সুললিতা বাঁচুক, বাঁচুক, —ভগবান, সুললিতাকে তুমি বাঁচাও!

সিংহাসন

বোম্বাই সাণ্ডহার্ষ্টে কয়েকঘর বাঙালীর বাস। পাড়াটি ছোট, তবু সিভিলিয়ান্ থেকে আরম্ভ করে' মাছিমারা কলের কেরাণী পর্য্যন্ত সবাইয়েরই মুখ দেখা যায়।

ছোট বাই-লেনটার মোড়ের বাড়ীটার আকর্ষণ অন্য রকম। নীচের তলাটায় একঘর দরিদ্র পার্শী পরিবার ভাড়া থাকে। দোতলার একদিকে থাকে সস্ত্রীক এক মারাঠি ভদ্রলোক; আর একদিকে আমাদের মিষ্টার। মিষ্টারের পুরো নাম এ-এন-চৌধুরী।

জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার। বয়স আন্দাজ বছর তিরিশ। সুপুরুষ। চোখ দুটো একটু কটা। দাড়ি-গোঁফ কামানো। মাথার চুলগুলি তামাটে রংয়ের। ধুতি-পাঞ্জাবী পরাটাকে সে মনে করে তার গর্ব্বের পক্ষে হানিকর। একদিকের সমস্ত ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়ে সে একাই থাকে।

জাহাজে সে যখন বেরোয়, পনেরো দিন আর তার তল্লাস পাওয়া যায় না। এমনও হয়েছে, দু'মাস তার দেখা নেই। জাহাজে চড়ে'

বৃহৎ পৃথিবীর দিকে সে যে মাঝে মাঝে কোথায় ভেসে পড়ে, তার আর ঠিক-ঠিকানা পাওয়া যায় না।

এডেন-এ গিয়ে একবার সে এক আরবী দস্যুকে ধরিয়ে দিয়েছিল। মাল্টায় গিয়ে কবে এক সময় সে ওখানকার আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উদ্গার দেখে এসেছে। গত বৎসর এমনি সময়টায় মার্সাইতে নেমে সে কিছুদিনের মতো ফ্রান্সের মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। দুনিয়াটাকে নিয়ে নিজের ইচ্ছামতো সে খেলা করে।

সম্প্রতি জিব্রাল্টার থেকে সে দিন-তিনেক আগে ফিরেছে। ছুটি এখন তার অবাধ, অন্ততঃ কিছুদিনের মতো ত বটে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তার ফ্ল্যাট্। সবশুদ্ধ খান-সাতেক ঘর। একটি মাত্র মানুষ সাতখানা ঘরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে থাকে। অল্পের মধ্যে সঙ্কীর্ণতায় কোণঠেসা হয়ে থাকা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। রাত্রে নিদ্রা-জড়িত দেহ নিয়েও সে কোনো কোনোদিন সাতখানা ঘরের মধ্যে একবার ছুটে গিয়ে পায়চারি করে' আসে। অথচ যেমন তার রাসভারি, তেমনি সে গম্ভীর।

আরদালি আছে, বাবুর্চ্চি আছে, একটা তৈলঙ্গী চাকরও আছে। সমস্ত দিনে অন্তত বার-দশেক তার খাবার আসে। রান্নাঘরটি তার হিন্দু-মুসলমানের মিলন-ক্ষেত্র।

আফিস ঘরে বসেছিল একখানা 'বম্বে ক্রনিকেল্' হাতে নিয়ে। টেবিলে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত সাময়িকপত্র—সায়েণ্টিফিক্ আমেরিকান্, হুইল, পপুলার সায়েন্স প্রভৃতি। চায়ের পেয়ালাটা খালি, আর একটা ডিশ-এ গোটাচারেক পরিত্যক্ত আঙুর, এক কুচি কলা, এক ভুমো নাশপাতি। বর্ম্মা চুরুটটা অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় অ্যাশ-ট্রের ওপর রাখা। বেলা আন্দাজ তিনটে।

একটি কালো রোগা হ্যাংলা ছোক্‌রা, বয়স আন্দাজ পঁচিশ, একটি

ধুতি ও পিরাণ পরণে,—অত্যন্ত বিনীত পদক্ষেপে সন্ত্রস্ত হয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। নিতান্তই বাঙালীর ছেলে। মুখে কোনো বিশেষ ছাপ নেই। জনসাধারণের ভিতরকার একখানি মুখেরই মতো। নাম নরেন।

কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে মিষ্টার বল্‌ল—তিনবার তোমাকে ডেকেছি, একবারো শুনতে পেয়েছ?

মাথা হেঁট করে' ছেলেটি বল্‌ল—আজ্ঞে না!

ছিলে কোথায়?—কাগজটা সরিয়ে রেখে সোজা হয়ে মিষ্টার বসলো,—ফ্যাক্টরী আজ বন্ধ, কোথায় আড্ডা মারতে গিয়েছিলে? অনুগ্রহের ওপর যে থাকে, তার এত বাড়াবাড়ি কেন? হাড়িডোমের মতন চেহারা নিয়ে যেখানে সেখানে গিয়ে বসতে লজ্জা করে না? কোথায় গিয়েছিলে শুনি?

ভয়ে ভয়ে মৃদুকণ্ঠে নরেন বল্‌ল—ওপরে।

ওপরে? ওপর ত ফাঁকা! একা কি করছিলে সেখানে?

একজনরা নতুন এসেছেন, তাই—

কে? কে এসেছেন? হুইজ হি? হোয়াট ইজ হি?

রাগ আর মিষ্টারের পড়তে চায় না।

নরেন বল্‌ল—তিনি রায় বাহাদুর, খুব ভালো লোক।

রায় বাহাদুর! ড্যাম ইউ! কই দেখি কেমন লোক, চল। আমার লোককে কন্‌ফাইন করে' রাখার তাঁর কী অধিকার! চল!

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সরু বারান্দাটা পার হয়ে মিষ্টার তেতলার সিঁড়িতে উঠ্‌তে লাগল। নরেন ছিল তার পিছনে পিছনে।

তেতলায় উঠে ডান হাতি দরজায় পর্দা টাঙানো। সাড়া দিতেই ভিতর থেকে জবাব এল। গর্ব্বিত পদক্ষেপে মিষ্টার ভিতরে ঢুকতেই রায় বাহাদুর উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

আসুন।

নরেন পিছনে দাঁড়িয়েছিল। মিষ্টার একবার ঘরের চারিদিকে ভাল করে' তাকাল। বাঙালীর গৃহস্থালীর সঙ্গে তার তেমন পরিচয় ছিল না।

রায় বাহাদুর সস্নেহ হেসে বল্‌লেন—বসুন।

সশব্দে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে মিষ্টার বসলো ; সে শব্দটা এমনিই যে, পাশের ঘরের অস্ফুট কথাবার্তা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

বসে পড়ে' গলাটা ঝেড়ে মিষ্টার বল্‌ল—ভেবেছিলাম আপনি বাঙালী নন।

নরেন তার কণ্ঠস্বর শুনে এবার একটু স্বস্তি অনুভব করলো। মহেশবাবু সুন্দর একটুখানি হেসে তার কথার জবাব দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বল্‌লেন—বসো হে নরেন! দাঁড়িয়ে রইলে যে?

মিষ্টার একটুও ভূমিকা না করে' বল্‌ল—নরেন বোকার মতো এসেছিল এ দেশে, একটি পয়সাও হাতে ছিল না। একটা কাজ আমি ওকে দিয়েছি, এখন য়্যাপ্রেনটিস্,—আমার কাছেই থাকে।

সে যেন খুব বড় একটা অনুগ্রহ নরেনের ওপর করেছে! মহেশ বাবুর কাণে কথাগুলো বিসদৃশ ঠেক্‌ল।

—ভেবেছিলাম ভাল ছেলে, কিন্তু অত্যন্ত অকর্মণ্য, ফাঁকিবাজ,—ওকি এতক্ষণ আপনারই এখানে বসেছিল?

মহেশবাবু বললেন—কল্‌কাতায় আমার পরিচিত লোকের ছেলে, চেনাশোনা হল, একটু আলাপ করছিলাম,—আপনার বুঝি ওকে নৈলে চলে না?

চলে কিন্তু ওকে আমি সকল সময়েই কাজ করাতে চাই। বয়সে অত কুড়ে হ'লে—

পাশের দরজাটার পরদা এবার একটু সরে' গেল। এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে একটি তরুণী মেয়ে স্মিতমুখে ভিতরে ঢুকে পেয়ালাটি

মহেশবাবুর কোলের কাছে রাখ্‌ল। মিষ্টার সুমুখে বসে আছে সেদিকে সে গ্রাহ্যই করল না, বাইরের দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌ল – নরেনবাবু, ভেতরে আপনার চা রয়েছে, মা ডাকছেন, আসুন।

মেয়েটি চলেই যাচ্ছিল, মহেশবাবু বল্‌লেন—এখানে আর এক পেয়ালা দিতে হবে, ললিতা।

মিষ্টার এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, বল্‌ল—থ্যাঙ্কস্‌, আমি চা খেয়ে এসেছি—তারপর উঠে কয়েক পা এগিয়ে এসে পুনরায় বল্‌ল—শুন্‌তে পেলে না? ভেতরে যাও! হাঁ করে' বোকার মতো পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

নরেন ললিতার দিকে তাকিয়ে আহত পক্ষীর মতো মুখের একটা শব্দ করল মাত্র! খট্‌ খট্‌ করে' জুতোর শব্দ করতে করতে মিষ্টার নীচে নেমে গেল।

নেমে এসে সে আবার চেয়ারে বসলো। মনে হল, ওই 'আগ্‌লি' কালো বাঁদর-মুখো ছেলেটাকে লোকে বাড়ীর ভিতর ঢুকতে দেয় কোন্‌ রুচিতে? ষ্টুপিড্‌ ফুল! দেখলে যাকে ঘৃণা করে, তাকে সস্নেহে কি কেউ ভিতরে ডাকতে পারে?

*

নিজের সম্বন্ধে মিষ্টার অত্যন্ত সচেতন। ওখানকার ভদ্রসমাজে তার অবাধ যাতায়াত। সাহেব-সুবো তার বন্ধু। ধনী বোম্বাইওয়ালা ও সমৃদ্ধ পার্শী জমিদাররা তার হাত ধরা। বড় বড় হোটেলে তার নিমন্ত্রণ প্রায় লেগেই আছে। মোটর ছাড়া সে এক পাও চলে না। লাট সাহেবের ডিনার পার্টিতে নাকি যোগ দেবার জন্য তার কাছে দু' একবার পত্র এসেছিল।

বিধাতা তাকে রূপ দিয়েছিলেন, স্বাস্থ্য ছিল তার অটুট। বিদ্যা

এল, বারান্দায় এসে দেখ্‌ল, নরেনের ঘরে আলো জ্বল্‌ছে। এত রাতে তার ঘরে আলো? এগিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে বল্‌ল—কি হচ্ছে হে এত রাতে?

হাতের বইটা বন্ধ করে' নরেন বল্‌লে—এই একটু পড়ছিলাম। কিছু বলছেন?

মিষ্টার বল্‌ল—না, এমনি দেখতে এলাম। এত রাত পর্য্যন্ত জেগে থাকো কেন?

নরেন উঠে বসলো,—এইবার শোবো।

মিষ্টার বল্‌ল—তোমার কাজকর্ম্মে একটু অবহেলা এসেছে দেখতে পাচ্ছি, কেন বল ত'? এসব ভালো নয়—বুঝলে? যাকে পরিশ্রম করে খেতে হয়, তার পক্ষে ভদ্রতা সৌজন্য রাখা অচল। ওঁদের নিয়ে তোমার এখন নেশা ধরেছে, ওঁরা যখন চলে' যাবেন তখন তোমার সকল কাজে অনিচ্ছা এসে যাবে। সমস্ত উৎসাহ তোমার ফুরোবে।

নরেন একটু মৃদু প্রতিবাদ করে' বল্‌ল—তা ত নয়, আমি—

তাই, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। ওঁদের সঙ্গে থাকা, খাওয়া, ওঁদের নিয়ে বেড়ানো, ওঁদের কথা আলোচনা করা—এ মাখামাখির ফলাফল বড় খারাপ। ওঁরা বড়লোক, ওদিক দিয়েও তোমার বিশেষ সুবিধে হবে না। এই আমি শেষ কথা বলে রাখলাম। আমার হাতে থাকতে গেলে তোমাকে ওঁদের ত্যাগ করতে হবে।

শেষের দিক্‌টায় গলার আওয়াজে জোর দিয়ে মিষ্টার আবার চ'লে গেল।

বিছানায় শুয়ে সে সত্যই আনন্দ বোধ করল। রায় বাহাদুরের পরিবার থেকে সে তাকে বিচ্ছিন্ন করে' আন্‌তে পেরেছে—এই তার পরম তৃপ্তি। সে রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে সে ঘুমুতে পেরেছিল।

বললেন—ভাল করে' আপনার সঙ্গে আলাপ করা হয়নি সেদিন। নরেন আপনার প্রশংসা করছিল।

মিষ্টার বল্‌লে—ভুলেই গেছি, সামাজিক আলাপ পরিচয় ওসব আর আসে না। চিরকালের জন্যেই দলছাড়া।—নরেনের দিকে সে একবার তাকাল। মেয়েরা তখন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা বলছেন।

আচ্ছা, আসি এখনকার মতন—বলে' মিষ্টার একটি প্রতিনমস্কার করে' তৎক্ষণাৎ ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভয়চকিত দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে নরেনের কানদুটো তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে।

সে রাত্রে সহজে মিষ্টারের চোখে ঘুম এল না। তার জীবনটা সত্যি অদ্ভুত। তার কোনো সমাজ নেই, ধর্ম্ম নেই শিকড় নেই, আত্মীয় স্বজন পরিজন কোথাও কিছু নেই,—বিদেশে বিভূঁয়ে নির্ব্বান্ধব অবস্থায় এতগুলি বছর তাকে কাটাতে হয়েছে। তাকে কেউ ভালোও বাসেনি, ঘৃণাও করেনি; কাছেও টেনে নেয়নি, তাচ্ছিল্যও করেনি; তার জীবন সুখকরও নয়, দুর্ব্বহও হয়ে ওঠেনি। সমস্ত বয়সটা খুঁজলে একটিমাত্র নারীর আস্বাদও নেই, একটিমাত্র পুরুষের বন্ধুত্বও নেই। নিজে সে ছন্নছাড়া নয়, কিন্তু কোথাও কোনো শৃঙ্খলাও নেই। তার দিন কেটেছে। সে ভবঘুরে নয়, কিন্তু সংসারচ্যুত!

আলোটা জ্বলছিল, সেই দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগ্‌ল তার মুখের চেহারাটা কেমন! তার কি কোনো আকর্ষণ নেই, সে কি কারো মোহ আনতে পারে না? এই পৃথিবীর দিকে দিকে যে স্নেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, মোহ ভালবাসার শোভাযাত্রা চলেছে—এর মধ্যে তার কি কোনো স্থানই নেই?

আস্তে আস্তে সে উঠ্‌ল, ঘর থেকে অনভ্যস্ত নগ্নপদে সে বাইরে

প্রথম সে নিরুদ্দেশ হ'য়ে হাঁটতে সুরু করল। হেঁটে হেঁটে আজ সে নিজেকে ক্ষইয়ে ফেল্‌বে। আজ সে শুধু আহত হয়নি, ক্ষুব্ধ হয়নি, আজ সে নিতান্তই বিপন্ন। তার আত্মসম্মান পর্য্যন্ত আজ বিপদগ্রস্ত।

রেলের পুল পার হ'ল, বাবুলনাথের মন্দির ছাড়ালো, কয়েকটা বড় বড় হোটেল পিছনে রইল—সে এল সোজা একেবারে সমুদ্রের তীরে। এদিকটা বন্দর নয়, বেড়াবার জায়গা। বাঁ দিকে বহুদূরে ডক্‌গুলি দেখা যাচ্ছে—জাহাজে ডিউটিতে যাবার তার আর বিশেষ দেরি নেই— দিন ফুরিয়ে এসেছে।

সমুদ্রের তীর বহুদূর পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হয়ে ঘুরে গেছে। অপরাহ্ণ শেষ হয়েছে। দিকচক্ররেখাহীন মহাসমুদ্র চারিদিকে থৈ থৈ করছে। ঢেউগুলি একটু মন্থর। ফিকে সবুজ আর সোনালী আলোয় মেশানো ছলছলে জল। আকাশটা ঠিক নীল নয়, একটু ঝাপসা,—সূর্য্যের কয়েকটা রাঙা রশ্মি আকাশের বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ঝড়ো হাওয়া বইছে হু হু করে'।

সমুদ্রের দিকে মুখ করে' বহুসংখ্যক বেঞ্চি সাজানো। মেয়ে, পুরুষ, বোম্বাই, মারহাটি, গুজরাটি, তৈলঙ্গী, পার্শী—বহু জাতের অগণন নর-নারী জটলা ক'রে বসে রয়েছে। ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে মিষ্টার তাদের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

এই যে, আপনি কতক্ষণ ?—রায় বাহাদুর নমস্কার করে' সস্ত্রীক দাঁড়িয়ে পড়লেন।

মিষ্টার বল্‌ল—এই মিনিট কয়েক। একটু ঘুরতে এসেছিলাম এইদিকে।

নরেন আর আত্মগোপন করতে পারল না। একটু সরে যেতেই ললিতা ও তার মা তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। মহেশবাবু

বিকাল বেলা ফিরে এসে মিষ্টার আবার চেয়ারে বসলো। বয় এসে টেবিলের উপর চা ও খাবার রেখে দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—তার হুঁসই নেই। হাত পা ধোবার গরম জল ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কলার নেকটাইটা অন্তত ইতিমধ্যে খুলে ফেলা উচিত ছিল, কিন্তু সে গ্রাহ্যই করল না।

অনেকক্ষণ পরে উঠ্‌ল, বাইরে এল, বাথ্‌রুমের পাশে যে ছোট অন্ধকার ঘরটি,—ওই ঘরটিতেই নরেন কায়ক্লেশে রাত কাটায়—মিষ্টার সেই ঘরটির মধ্যে এসে দাঁড়াল। কেন? কেন তা সে নিজেই জানে না। দেখ্‌ল ঘরের মধ্যে ভাঙা একটি আধখোলা টিনের বাক্স, একখানি অল্প দামের পুরোনো বিলাতী কম্বল, বালিশের বদলে কয়েকখানি খবরের কাগজ রোলার করে' একটি ফালি দিয়ে বাঁধা, সামান্য কিছু চিঠি লেখার সরঞ্জাম—এ-ছাড়া ঘরটির মধ্যে আর কিছু নেই। দারিদ্র্যের চিহ্ন ঠিক নয়—একটি অখণ্ড বিরক্তি।

আজ সমস্ত দিন ধরে' একটি অতৃপ্তি তার সারা দেহের কোণে কোণে বাসা বেঁধেছিল। অনুক্ষণ রি রি করে' শরীরে যেন জ্বালা ধরেছে। এই যার গৃহসজ্জা, এমনি যার জীবন যাত্রা, অর্বাচীন অপোগণ্ড ওই কালো ছেলেটার জন্য এই গৃহস্থটির এত মাথা ব্যথা? যার কোনো পরিচয় নেই, আভিজাত্য নেই, জীবনে যার কোনো শৃঙ্খলাই নেই, এই বিদেশে যে একমুঠো অন্নের কাঙাল—সেই হ'ল এত বড় ক্ষমতার অধিকারী?

মিষ্টার নিজের ঘরে এসে বসলো। কিন্তু বসে' থাকতে সে পারল না। চাবুক মেরে কে যেন তাকে আবার দাঁড় করিয়ে দিল। তার অহঙ্কারে কে যেন প্রচণ্ড আঘাত করেছে।

নীচে নেমে সে রাস্তায় এল। তার নিজের ছোট মোটরখানি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে' আজ

বুদ্ধিতে সে অনেকের অগ্রণী। জীবনে উন্নতি করবার সকল মূলধন-গুলিই তার ভাঁড়ারে মজুত ছিল।

আর নরেন!

একটি বিদ্রূপের হাসি মিষ্টার আর চাপতে পারে না। আবলুশ কাঠের মতো গায়ের রং, তোবড়ানো দুটো গাল, কালো জামের মতো দুটো বিসদৃশ চোখ; রোগা,—গায়ের হাড়গুলি একটি একটি করে' গোণা যায়, হাত-পায়ের আঙুলগুলো শিকড়ের মতো—মুখখানা রং-চটা। লেখাপড়া বল্‌তে গেলে জানেই না, অল্পবুদ্ধি, অনভিজ্ঞ, অকর্ম্মণ্য, উপার্জ্জনে অক্ষম। জীবনে কোনো উচ্চ আশা নেই। ক্ষুদ্র, অবজ্ঞাত!

পৃথিবীর একটি ব্যর্থতম জীব!

নিতান্তই অনুগ্রহপ্রার্থীর মতো একটি পাশ থেকে নরেনের দিন কাটে। ঔদ্ধত্যের কাছে সে যেন মূর্ত্তিমান বিনয়।

—ও কি হচ্ছে? অমনি করে' চিঠির কাগজ ভাঁজ করে? তুমি যদি লেখাপড়া জানতে, ওতে তোমার চিঠি লেখা চল্‌তো, আমার চলবে না। বাজার ফর্দ্দের কাগজে চিঠি লেখাটা ভদ্রতা নয়।

কথার কি তীব্রতা! নরেন বলে—একটু ভুল হয়ে গেছে, আচ্ছা আমি ঠিক করে' দিচ্ছি।

ভুল যা, তা ভুল। তাকে আর সারানো চলে না।

সে দিন সিঁড়ির মুখে দু'জনে দেখা। মিষ্টার তাড়াতাড়ি নামছিল।

কোথা ছিলে এতক্ষণ?

এই একটু,—এই বাজারের দিকে।

কেন?

দু' একটা জিনিস কেনবার জন্যে।

কে আনতে বললে?

থতমত খেয়ে নরেন বলল—আমার নিজেরই, আনতে বলেনি কেউ।

হুঁ, ওই যে পকেটে, ওটা কি বেরিয়ে রয়েছে, বার কর দেখি?

বার করবার পর দেখা গেল, এক শিশি সুগন্ধী তেল, এক শিশি এসেন্স, খান-দুই সাবান, দু-একটা জিনিস সে অতি কষ্টে জামার ভিতর লুকিয়ে রাখল।

এ সমস্তই তোমার? মিষ্টারের চোখ দুটো আগুন হয়ে উঠেছিল।

না, সব আমার নয়। মহেশবাবুদের কিছু কিছু আছে।

তুমি অন্যের কাজ করবে, অন্যের বাজার করে' আনবে, কি সর্তে? তোমার একটু অপমান বোধ নেই?

নরেন ধীরে ধীরে বল্‌ল— এতে অন্যায় মনে হয় নি।

তা মনে হবে কেন? ভগবান তোমায় গণ্ডারের চামড়া দিয়েছে সে কি এত সহজে বেঁধে?

এমন সময়ে উপরের সিঁড়ি থেকে ললিতার স্পষ্ট গলার আওয়াজ এল—নরেনবাবু, শিগ্‌গির চান্‌ করে' আসুন, আপনার আপিসের যে বেলা হয়ে যাচ্ছে।

ললিতা গলা বাড়িয়ে ছিল,তিনজনেই একবার চোখোচোখি হলো; ললিতা তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে' গেল।

মিষ্টারের রাগ কেমন জানি একটু শান্ত হয়ে এল। বল্‌ল— আজকাল বুঝি ওপরে ওঁদের কাছেই খাওয়া হয়? আমার রান্নাঘর বয়কট করলে কবে থেকে?

ওঁরা যেদিন থেকে এসেছেন সেদিন থেকেই আমি—

আই সী। আমি ত আর তোমার খবর-টবর রাখি না, কেমন করে' জান্‌ব বল! অল্‌ রাইট!

মিষ্টার তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

দিন তিনেক বাদে সেদিন দুপুর বেলা সে কোথায় গিয়েছিল, ফিরে এসে শুনলো, নরেন আজ কাজে বেরোয়নি !

কেন ?

আরদালিটা বল্‌ল—সকাল বেলা তিনি ওপরে উঠেছেন, এখনও নামেননি।

রাগে একেবারে মিষ্টার অন্ধকার দেখল। কাজে যদি নরেন কামাই করে, লজ্জা যে তারই। কর্ম্মঠ, তৎপর এবং নিয়মানুবর্ত্তী ব'লে সে যে নরেনের সম্বন্ধে পরিচয়-পত্র দিয়েছে। তার সম্মান বজায় থাকবে কেমন করে' ?

বোলাও উস্‌কো।

আরদালি ছুটলো কিন্তু মিনিট কয়েক পরে এসে জানালো, সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

জামা কাপড় না ছেড়ে মিষ্টার নিজেই গেল। হন্ হন্ করে' ওপরে উঠে গিয়ে ডাকল—মহেশবাবু ?

বার-দুই ডাকবার পর দরজাটা খুলে গেল। ললিতা বেরিয়ে এসে বল্‌ল—মহেশবাবু নেই।

নেই ? দরকার ছিল যে !

দরকার ছিল বল্লেই কি তাঁকে থাকতে হবে ?

তা নয়—মিষ্টার বল্‌ল—আমি শুধু দরকারের কথাটা বলছি।

গোপনীয় বা লজ্জাকর যদি না হয় আমাকে বলুন।

মেয়েটির কণ্ঠে সে কী দৃঢ়তা। মিষ্টারের রাগ যেন উবে গেল।

সোজা হ'য়ে মিষ্টার বল্‌ল—নরেন কোথায় ? এখানে আছে ?

কি দরকার তাকে বলুন ?

কি দরকার সেটা আপনার কাছে না বললেও চলবে। তার এত

বড় স্পর্দ্ধা, এতখানি সাহস কবে থেকে হলো যে, সে আমাকে লুকিয়ে পালিয়ে এসে এখানে আড্ডা দেয় ? ডাকুন তাকে।

ললিতা দীপ্ত কণ্ঠে বল্‌ল—আপনারা কত করে' তাকে মাইনে দেন ?

মাইনে ? সে কী এমন কাজের লোক যে মাইনে পাবে ? কী তার কাজের দাম যে—

ললিতা বল্‌ল—তবে যান, রেখে দিন্‌গে আপনার চাকরী, সে করবে না—তার হয়ে আমিই জবাব দিচ্ছি। যান্‌, কি হবে তার কাছে এ সম্বন্ধে আলোচনা করে' ! যে কাজের কোনো দাম নেই, সে কাজ সে আর করবে না।

মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে' দিয়ে ললিতা ভিতরে চলে' গেল।

অপমান ! তা অপমান বৈ আর কি। কিন্তু মিণ্টার যে সৃষ্টিছাড়া নিয়মের মানুষ ! তাকে যে আঘাত করবে, আহত করবে, তাকে যে মুখের উপর অপ্রতিভ করবে, মিষ্টার মনে মনে তাকেই গ্রাহ্য করে, শ্রদ্ধা করে তার প্রতি কেমন একটা আকর্ষণ বেড়ে যায়। ললিতা ভিতরে চলে গেল কিন্তু তার অপরূপ রূপের মাধুর্য্যটুকু সে যেন মিষ্টারের চারিদিকে পুঞ্জ পুঞ্জ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

মিষ্টার যখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিল তখন তার মুখে অল্প একটু হাসি লেগে রয়েছে।

তারপর এ গল্পের আর একটিমাত্র অধ্যায় বাকি দুনিয়ার নানা ঘাটে ঘুরে মিষ্টার অনেক দেখেছিল—এ হচ্ছে তার অভিজ্ঞানের শেষ পরিচ্ছেদ।

আজ সন্ধ্যায় তার যাত্রার দিন, এবার আবার অনেক দিনের জন্য দূর সমুদ্রে পাড়ি দিতে হবে। অষ্ট্রেলিয়ার জাহাজে তার ডিউটি পড়েছে।

দুপুর পার হয়ে অপরাহ্ণে গড়িয়েছে। সাজসজ্জা তার হয়ে গেছে—এবার শুধু নরেনের অপেক্ষা। নরেনকে সে ভালো চোখে দেখতে পারে না, অবজ্ঞা করে, তিরস্কার করে, জনসমাজে তার অবস্থার দৈন্যকে নিয়ে ব্যঙ্গোক্তি করে কিন্তু যাবার সময় এই ঘর-দোর, জিনিষপত্র, যথাসর্ব্বস্ব—সমস্ত কিছুর দায়িত্ব তার উপর সে দিয়ে যাবে। নরেনকে বিশ্বাস না করে' গেলে তার চলে না।

আফিস থেকে ফিরতে নরেনের তখনও একটুখানি বিলম্ব আছে। মিষ্টার শিষ্ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

নরেনের ঘর খোলা, ঘরে সে চাবি বন্ধ করে না। মিষ্টার একবার ঢুকল। গত রাত্রের জীর্ণ বিছানাটি তখনো ছড়ানো রয়েছে, আজ নানা কাজের জন্য চাকরটা তার ঘরে ঢোকেনি। মিষ্টার পায়ের জুতোর কোণ দিয়ে বিছানাটাকে এক পাশে সরিয়ে দিল। এটা তার চরিত্রের জঘন্যতা নয়—এ হচ্ছে তার অভ্যাস। বালিশটা যখন ছিটকে এক পাশে গিয়ে পড়ল, তার তলা থেকে বেরোলো একখানা চিঠি। গোলাপী রঙের কাগজে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা। মিষ্টার সেখানি হাতে করে' তুলে নিল।

অন্যের পত্র পড়া তার কোনোদিনই অভ্যাস নয় কিন্তু নরেনের সম্বন্ধে এ নিয়ম পালন করে' চলা তার পক্ষে অসম্ভব।

বাঙলা ভাষা সে ভালো পড়তে পারে না,. তবু হাঁচিয়ে হাঁচিয়ে দেখে চল্‌ল —

শ্রীচরণেষু,

দু'দিন ধরে' ভেবেছি তোমাকে এ চিঠি লিখবো কি না। আমি যতবার তোমাকে বলবার চেষ্টা করেছি তুমি উদাসীন হয়ে থেকেছ। মা ও বাবা বোধহয় বুঝতে পেরেছেন। আমাকে ওঁরা যার-তার হাতে

তুলে দেবেন, আমি সেটা পছন্দ করিনে। আমি তোমারই কাছে থাকতে চাই।

তুমি যদি আমাকে বিয়ে কর তাহলে কোনো বাধার সৃষ্টি হবে না। বাবা আর মা আড়ালে সেদিন যেকথা বলছিলেন তা শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমাকে এ চিঠি লিখতে পারলাম।

আমার ভালবাসা নিয়ো।

তোমারই ললিতা

পুঃ—কাল আমরা দেশে ফিরবো, তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। নিজেকে আর লুকিয়ে রেখো না, তোমার অবস্থা ত ভালই, তবুও এমন দীনহীন বলে' নিজের পরিচয় দাও কেন? এযে আমারও অপমান! নিজেকে ছোট করে' দেখলে বড় হব কেমন করে'?—ইতি ল।

কিন্তু শেষ ছত্রটি পড়বার সময় আর মিষ্টার পেলে না, নরেন এসে ঘরে ঢুকলো।

চিঠিখানা হাতে করে' নিয়ে মিষ্টার উঠে দাঁড়ালো। তারপর একটু হেসে কাছে গিয়ে নরেনের একখানা হাত টেনে নিয়ে চেপে ধরল। গলাটা পরিষ্কার করে' নিয়ে বল্‌ল----মানুষ হিসেবে আমি খুব খারাপ লোক, এখনো তোমার ওপর আমার হিংসে হচ্ছে। বসো। নরেনকে জড়িয়ে ধরে' সে নিজের চেয়ারটার উপর তাকে বসালো।

তারপর চিঠিখানা তার হাতের ভিতর গুঁজে দিয়ে ট্রাউজারের দুই পকেটে হাত পুরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—যদি একটু সেণ্টি-মেণ্টাল্ হই কিছু মনে করো না। তোমার ওই চিঠিখানা পড়ে' আমার মনে হল, তুমি great, তোমার ভাগ্যটা যদি আমি পেতাম নরেন, তাহলে—but I should check myself.

সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে এসেছিল, ঘরে আলো জ্বালা হয়নি। পকেট

থেকে একটি সিগারেট বার করে' দেশালাই জ্বেলে সে যখন ধরাতে লাগলো, সেই চকিত আলোয় নরেন দেখলো, তার চোখ দুটিতে জল চক চক করছে।

সমুদ্রে ভেসে যাবার আগে—really, I was thinking of my own life—এ জীবনে কিছুই ত নেই,—infinitely alone.

হৃদয়াবেগ আপনার ভাষা আনে সঙ্গে ক'রে।

দেশালাইটা আর একবার জ্বেলে হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিষ্টার পুনরায় বল্‌ল—যাক্‌, সময় হয়ে গেছে, আর দেরী করতে পারিনে। আরদালি—আরদালি?—All right, চললাম ভাই!—আর একবার নরেনের করমর্দ্দন করে বল্‌ল----Good bye, good luck!

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল, সিঁড়ির কাছাকাছি গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে সে আর একবার বল্‌ল—yes, my last request, ললিতাকে বিয়ে করতে তুমি অমত করো না ভাই। She is your beloved Helen.

ছড়িটা ঘুরিয়ে শিষ দিতে দিতে সে টক টক করে' সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল!

সিড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ললিতার চোখদুটি তখন আনন্দ ও বেদনায় ভ'রে উঠেছে।

—----—

মোহ

কুড়ি বাইশ বছরের একটি মেয়ে অতি সন্তর্পণে ও সঙ্কোচে গায়ে-মাথায় মুড়িসুড়ি দিয়ে আসছিল পথ পার হয়ে। একটি সলজ্জ ভীরুতা তার বড় বড় চোখে, মুখে একটি ম্লান দীপ্তি,—চকিত সন্ত্রস্ত পায়ে এঁকে বেঁকে হিল্ হিল্ করে' একটি ছোট বাড়ীর বারান্দায় উঠে দরজার কড়া নাড়্‌ল। মুখখানি নশ্বর, তবুও মনে হ'তে পারে, সে মুখে গত জীবনের একটি ক্লান্তি ও করুণ অসহায়তা আবছায়ার মতো লেগে রয়েছে।

একটু পরেই গেল দরজাটি খুলে'। ছোট একটি হিন্দুস্থানী ছেলে মুখ বাড়িয়ে বলল—আও, বৈঠো ভিতরমে। অভি ডাংদার বাবু আতা হায়।

মেয়েটি ভিতরে এল না, দরজার কাছেই রইল দাঁড়িয়ে। কেতা-দুরস্ত ডাক্তাররা খবর না দিলে যে দেখা করতে আসেন না,—মুখ দেখে মনে হ'ল, মেয়েটি বোঝে এ কৌশল!

ঘরখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেয়ালগুলিতে দেশের কয়েকজন নাম করা নেতার ছবি, তার নীচে এক-একখানি জাপানী চিক টাঙানো। ওধারে টেবিলের উপর একটি নতুন চরকা, এক দিকে ছবি আঁকবার কতকগুলি সরঞ্জাম, তার পাশে দুটি আল্‌মারিতে হোমিওপ্যাথী ওষুধের শিশি সাজানো। মেঝের এক কোণে একটি সেল্‌ফ-এর উপর কতকগুলি সাময়িক পত্র সযত্নে গোছানো।

ভিতরে পায়ের শব্দ হতেই মেয়েটি নিজেকে সহজ করে' নেবার জন্য গা ঝাঁকানি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে' স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

আধুনিক ফ্যাশনের মাদ্রাজী একজোড়া চটি পায়ে নতুন পাঞ্জাবী গায়ে নতুন ডাক্তার শ্রীমান দ্বিজেন লাহিড়ী এসে ঢুকলো ঘরের মধ্যে।

চোখচোখি হতেই ডাক্তার হাঁ করে' কথা বল্‌তে গিয়ে হঠাৎ অবাক হয়ে থেমে গেল। মেয়েটি মাথা নীচু করল।

—আশ্চর্য্য করলে অজয়া, আমি জানি তুমি মরে' গেছ। তারপর কোত্থেকে এতদিন পরে?

মৃদুকণ্ঠে অজয়া বল্‌ল—এখানেই ছিলাম।

এখানেই? এই কাশীতেই? দেখতে পাইনি ত! তোমার লুকিয়ে বেড়াবারও অভ্যেস আছে বটে! বলি, ও কি হয়েছে? ময়লা আর ওই অমন ফুটো কাপড় পরে' এতখানি রাস্তা আসতে পারলে?

অজয়া না দিল উত্তর, না একটুও কাঁপ্‌ল।

দ্বিজেন বল্‌ল—শেষবার যেদিন তোমাকে দেখেছিলাম, তুমি ছিলে আশমানী রঙের পার্শী শাড়ী পরে', আজ তুমি মুদির স্ত্রীর চেয়েও জঘন্য কাপড় পরেছ। ছি ছি, লোকনিন্দা কি দেশ ছেড়ে গেছে?

অজয়া কথা বল্‌ল এবার—এ কি আমার সাধ?

তা জানিনে, আজকাল একদল গেরস্থ ঘরের মেয়ে দেখা যাচ্ছে—দরিদ্র বলে' পরিচয় দেওয়াটা যারা করেছে সত্যিই ফ্যাশন।—যাই হোক্, ওখানে দাঁড়ালে যে? বসো না ওই ইজি-চেয়ারটায়!

অজয়া বল্‌ল—না।

কেন? কাপড়খানার অবস্থা ভেবে নড়তে লজ্জা হচ্ছে? কিন্তু লোক যে মনে করতে পারে তুমি এসেছ ভিক্ষে করতে!

সে ত' আর মিথ্যে নয়!

দ্বিজেন কথাটাকে দিল ঘুরিয়ে। বল্‌ল—তাই ত বলি, চাকরটার কাছে খবর পেয়ে ভাবলাম, এমন দুঃসাহসী রুগী কে আছে, আমার কাছে হঠাৎ যে আসবে আত্মহত্যে করতে! হবে কেন? বরাৎ কি এত সহজে ফিরলেই হ'ল? দেশের কাজে কি আর সাধে নামতে চাইছি অজয়া?—আচ্ছা, তুমি অমন উস্‌খুস্ কচ্ছ কেন?

অজয়া বল্‌ল—আবার একটু তাড়াতাড়ি আমায় যেতে হবে।

ও, এসেছিলে কেন সেটা একবার বল? আচ্ছা থাক্, বলতে হবে

না—তোমার মতো এমন মেয়ে আমার খোঁজে আসে, এইটুকু নিয়েই বন্ধুসমাজে বেশ গর্ব্ব করতে পারব!

আপনি ত জানেনই আমার আসার কারণ!

হাল্‌কা করে' কথা বলার অভ্যাসটা দ্বিজেনের হঠাৎ গেল ঘুরে। বল্‌ল—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তুমি একটি কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছ, আমি দেবো আর তুমি নেবে! দুঃখ জানাবার একঘেয়ে রীতিটা তোমরা ছাড়তে পার না অজয়া? হাত পেতে ভিক্ষে করে' বার বার নিজেকে অপমান করো কেন?

একটু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে অজয়া বল্‌ল—তা ছাড়া আর কি করি বলুন। আমার এ অবস্থায় পড়লে—

তাই বটে! ভিক্ষাবৃত্তিটা তোমাদের একেবারে আচ্ছন্ন করে' রেখেছে। অথচ তোমরা চাইতেই জানো, নিতে জানো না।

অজয়ার উষ্ণতা ছিল, কিন্তু তার চেয়েও ছিল ঔদাসীন্য। সকাল বেলা কথা-কাটাকাটি করবার প্রবৃত্তি ছিল না তার।

দ্বিজেন বল্‌ল—এখন আছো কোথায়? কি রকম ভাবে থাকো আজকাল, বলই না?

অজয়া চুপ করে' রইল।

উত্তরও দেবে না, ঠিকানাও দেবে না—কেমন? কেমন করে' কি নিয়ে যে তোমার দিন কাটে ভেবে অবাক হই। আজ তুমি এসেছ, জানি আবার বহুদিন তোমার দেখা পাবো না; একেবারে দেশছাড়া রাজ্যিছাড়া নিরুদ্দেশ! সেদিন যে অদ্ভুত চেহারা নিয়ে এসেছিলে, রাস্তার ধূলোয় গড়াগড়ি দিলেও মানুষের অমন চেহারা হয় না!

মুখ ফিরিয়ে অজয়া বল্‌ল—সকল দিন ত আর মানুষের সমান কাটে না!

কাটে না জানি,—দ্বিজেনের কণ্ঠে কেমন একটি কারুণ্য ফুটে উঠ্‌ল

—তা বলে' তোমার এমন দুরবস্থা হবার কথা নয় ত! তুমি স্বাধীন মেয়ে, বিবাহ করনি, কারু পেট চালাতে হয় না, কেউ তোমার মুখ চেয়ে নেই, কোনো অপবাদ রটেনি,—তোমার জীবনের ধারা অন্য রকম হওয়া উচিত ছিল অজয়া!

দেখতে দেখতে দু' ফোঁটা জল নেমে এল অজয়ার চোখ থেকে।

দ্বিজেন বল্‌ল—এই শহরে কত রকমে তোমাকে দেখলাম বল ত! মাঝে একবার করলে সন্দেশের দোকান। যেই সেটা লাভজনক হয়ে এল, অমনি সেটা ছেড়ে দিয়ে কালীতলার মন্দিরে পুরুতের পায়ের সেবা দিলে স্বুরু করে'। অমন 'বাণী-ভবনের' মাষ্টারিটা হঠাৎ একদিন তুমি ত্যাগ করলে; কিছুদিন কাটলে চরকা; ভালো লাগ্‌ল না, একদল মেয়ে নিয়ে মাঝে দিনকতক রাস্তায় রাস্তায় মোড়লী করে' বেড়ালে। কী মন নিয়ে যে সংসারে এলে, কিছুতেই তোমায় তৃপ্তি দিল না! তারপর সেদিন জানলাম হরিলাল সেন-এর বাড়ী রাঁধুনির কাজ নিয়েছ। বেশ ত, সে জায়গা ছাড়লে কেন?

সে আপনার শুনে কি হবে?

ডাক্তার বল্‌ল একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে—ও, তা—সে কথা সত্যিই বলেছ, তোমার সকল কথা আমিই বা কেন শুন্‌তে যাই··এম্‌নিই বল্‌ছিলাম।

অজয়া বল্‌ল—বিন্ধ্যাচলে গিছলাম, সেখান থেকে সন্নিসি ঠাকুর নিয়ে গিছলেন অযোধ্যায়—

দ্বিজেন বল্‌ল—সন্নিসি ঠাকুর?

হ্যাঁ, ফিরে এসে দেখি আমার চাকরি আর খালি নেই!

তাড়াতাড়ি উঠে দ্বিজেন একবার গেল ভিতরে, কিন্তু ফিরে এল আবার সঙ্গে সঙ্গেই। হাতে করে' সরু পাড়ের একখানা ধুতি এনে ঝুপ্‌ করে' অজয়ার গায়ের উপর ফেলে দিয়ে বল্‌ল—ভেতরে গিয়ে

আগে কাপড় বদ্‌লে এস। কি চাও এবার বল শুনি। রান্নার জিনিস-পত্র, না পয়সা ?

ছলছলে দুটি চোখ তুলে অজয়া আবার নীচু করে' নিল। কিন্তু সে সেখান থেকে এক পাও নড়লো না!

দ্বিজেন হঠাৎ কঠিন কণ্ঠে বল্‌ল—একটি জিনিস বাঙলা দেশের মেয়ে জাতের মধ্যে নেই, সেটি হচ্ছে অপমানবোধ। যতই তোমরা স্বাধীন হও, দৃঢ় হও, আমাদের কাছে তোমরা নীচু হয়ে, দুর্ব্বল হয়ে, অসহায় হয়ে থাকতে ভালবাসো। আমাদের কাছে লাঞ্ছনা পেয়ে নিলর্জ্জের মতো আমাদেরই কাছে প্রতিকারের জন্য ছুটে আসো এই হচ্ছে তোমাদের ভীরুতার পরিচয়! যাক্ গে।

টিনের একটা বাক্স খুলে' দুটি টাকা এনে তার হাতে দিয়ে দ্বিজেন আবার বল্‌ল—এইটি হলো খুব সম্মানের—কেমন? নিজেকে সর্ব্বদা লুকিয়ে রাখবে, অথচ গোপনে এসে একজন বাইরের লোকের কাছে আর্থিক অনুগ্রহ নিতে তোমার বাধে না। একে বলে তোমাদের জাতীয় স্বভাব! শুধু এক মুঠো ভাতের জন্যে পায়ের তলায় পোকার মতো হয়ে থাকাই তোমাদের বংশগত ধারা—নিশ্চিন্ত আরামে অপমান সইবার তৃপ্তি এ দুনিয়ায় শুধু তোমরাই জানলে। আর কি, হাত পাতা হল, এবার যাও?

অজয়া হয়ত সবই বোঝে। পা বাড়াবার আগে সে বল্‌লে—যা দিলেন, এর থেকে আপনার সেদিনকার ওষুধের দামটা কেটে নিন্। সেই যে সেবার বাকি রেখে গিছলাম।

দ্বিজেন বল্‌ল—ওই যা দিলাম, ওর থেকে? - অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্‌ল—তোমাদের হিসেব এর চেয়ে বিশেষ উঁচুদরের নয়। মৌলিক কিছু তোমাদের নেই, আমাদের নিয়ে আমাদেরই ওপর আরোপ করো।

প্রতিবাদও করল না, এ অপমানের দান ফিরিয়েও দিল না। ধীরে

ধীরে বারান্দা থেকে নেমে অজয়া রাস্তায় পড়ে' একটা গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দ্বিজেন সেখানেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে শরৎকালের আকাশে রংয়ের ছোপ ধরেছে। সাদা ছেঁড়া ছেঁড়া তুলোর মতো মেঘ গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বারান্দার ধারে শিউলি গাছের পাশে এসে পড়েছিল এক ঝলক্ ধবধবে রোদ। ছুটির দিনের মতো একটা অনিয়মের বিশৃঙ্খলা যেন ঘুরে ঘুরে দুলে দুলে বেড়াচ্ছে আকাশে-আকাশে, জলে-স্থলে!

দরজার দিকে আর একবার নজর পড়তেই দ্বিজেন দেখল, কপাটের উপর কাপড়খানি তুলে রেখে অজয়া চলে গেছে!

প্রয়োজনের দিনে আর্থিক অনুগ্রহ সে হাত পেতে নিতে দ্বিধা করল না, কিন্তু হৃদয়ের দাক্ষিণ্যকে দিয়ে গেল ফিরিয়ে।

মাঝখানে মাত্র কয়েকটি দিন।—

হঠাৎ সেদিন আবার দেখা হয়ে গেল স্নানের ঘাটে। এক হাতে ঘটি, আর এক হাতে ভিজা কাপড়—নির্জ্জন মধ্যাহ্নে স্নান করে উঠে সবেমাত্র অজয়া পথে নেমেছে।

এদিকে যে?

দ্বিজেন বল্‌ল—রোজই ত যাই এই দিক দিয়ে। তুমি যাবে কোন্ দিকে? বাসায় যাবে ত?

একটু থতমত খেয়ে ইতস্ততঃ ক'রে অজয়া বল্‌ল—মন্দিরে।

চল একটু কথা আছে।

সরু গলিতে লোকজনের ভিড় বিশেষ নেই। দুজনে পাশাপাশি চলতে লাগল। দ্বিজেন বল্‌ল—এখন চান্ করলে, রান্না হবে কখন?

অজয়া বল্‌ল—এই যাবো, এইবার গিয়ে···

তবে আর মন্দিরে কেন ?

এখনো আহ্নিক হয়নি।

আহ্নিক ? ঠাকুর-দেবতার সখ আবার মাথায় কবে থেকে ঢুক্‌লো ?

উত্তর দিল না অজয়া

দ্বিজেন বল্‌ল—সত্যি কথা বলব ? ঠাকুর-দেবতার ওপর এতটুকু শ্রদ্ধা তোমার নেই। নিজের মনের শুধু একটা তৃপ্তি খুঁজে বেড়াচ্ছ।

অজয়া বল্‌ল—লোকেরা এই কথাই ভাববে।

এখনকার লোকমতকে আমি শ্রদ্ধা করি।

ফুলের দোকানের কাছে এসে অজয়া থাম্‌ল। আঁচল থেকে একটি পয়সা খুলে দিয়ে একপাতা ফুল নিয়ে সে আবার চল্‌তে লাগ্‌ল। তার স্বল্প কথার মধ্যে, চলার মধ্যে, এই ফুল কেনার মধ্যে কেমন একটি কাঠিন্য এবং দৃঢ়তা ফুটে উঠ্‌ছিল। দ্বিজেনের মতো শত লোকের অবজ্ঞাও তাকে যেন টলাতে পারবে না !

মন্দিরের দরজার কাছে এসে সে বল্‌ল—কি করবেন ?

দ্বিজেন বল্‌ল—কথা বলা ত হল না !

তবে জুতো ছেড়ে ভেতরে এসে বসুন, আমি তাড়াতাড়ি করে'...

দ্বিজেন আর প্রতিবাদ করতে পারল না, এ যেন অজয়ার অধিকৃত গণ্ডীর মধ্যে সে এসে পড়েছিল। জুতোটি দরজার কাছে ছেড়ে রেখে সে আস্তে আস্তে গিয়ে নাটমন্দিরের চৌতারায় বস্‌ল।

বসে রইল সে অনেকক্ষণ। এক ফাঁকে সে দেখ্‌লো অজয়া দিব্যি পরিপাটি করে' গুছিয়ে পুষ্পপাত্রের মধ্যে ফুলচন্দন সাজিয়ে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে বসে আছে। আবার গেল খানিকক্ষণ। এবার মুখ তুলে সে দেখ্‌ল, আঁচলের ভিতর থেকে 'নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি' বা'র করে' গভীর সুরে অজয়া স্তব পাঠ করতে সুরু করেছে। একটা তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার বক্র হাসি দ্বিজেনের মুখে ফুটে উঠল।

স্তব পাঠ সহজে আর শেষ হতেই চায় না!

শেষে একেবারে অধীর হয়ে দ্বিজেন যখন তাকে ডাকবার উপক্রম করল, দেখে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে' অজয়া প্রণাম করছে। করছে ত করছেই। সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন না দিলে এমন প্রণাম মানুষের সহজে আসে না। দ্বিজেনের ঘাড় হেঁট হয়ে এল।

উঠে এক সময় আস্‌তে হলো বৈ কি। যে-দৃষ্টি রাঙা হয়ে ফুলে উঠেছে তাকে গোপন করবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা প্রকাশ পেতে লাগল।

মন্দির থেকে বেরিয়ে দুজনে পড়ল আবার টানা গলির পথে। অজয়া বল্‌ল—এইবার আপনি যাবেন ত?

কোনো কথাই হলো না যে।

ম্লান হাসি হেসে অজয়া বল্‌ল—বলবো বলেছেন তখন থেকে, বলেই ফেলুন না!

দ্বিজেন একটু আহত হল। বলল, তুমি কি ভাবছো, কোনো একটা কথা বলার ছুতো নিয়ে তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ থেকে নিচ্ছি?

তা আমি মনে করিনে।

দ্বিজেন চুপ করে রইল কিয়ৎক্ষণ। কিন্তু দুর্ব্বল মানুষের মতো খানিকটা ভূমিকা না ক'রে সে পারল না। বল্‌ল—এতক্ষণ যে কথাটা বলব বলে' জোর নিচ্ছিলাম, তোমার এসব দেখে তা আর বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না!

কোন সব?

এই তোমার, এই ধর গিয়ে পূজো, স্তবপাঠ··· তা বলে মনে করো না এ সব আমি বিশ্বাস করি?

করেন না?

না না। বলে দ্বিজেন খানিকটা দম নিল। তারপর বল্‌ল—তুমি শৈলেনের কাছে কেন গিয়েছিলে?

সাপ দেখে অজয়া যেন শিউরে উঠল —আপনি কেমন করে জানলেন ?

সে আমার বন্ধু।

বন্ধু ? তার সঙ্গে মেশেন আপনি ?

সে পরের কথা। তুমি নাকি টাকা ধার চেয়েছিলে তার কাছে ? কি সর্তে ?

অজয়া বলল - কিছুই না ! ধারও তিনি দেননি।

বিপদে কাউকে সাহায্য করবার মতো বুক তার নেই, তা জানি কন্তু তুমি চেয়েছিলে কিসের অধিকারে ?

ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে অজয়া বল্‌ল—এ সব কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন আপনি ?

দ্বিজেন সুরটা নামিয়ে নিল। তার পর বক্তৃতা দিতে সুরু ক'রে বল্‌লে—ভালোবাসো আপত্তি নেই, কিন্তু এটা জেনো ভুল বোঝায় ভালবাসা নষ্ট হয় না, অবজ্ঞায় খোয়া যায় না, স্বার্থপরতায় ভাঙে না—ভালবাসা ধ্বংস হয়ে যায় যেখানে পয়সার কথা ওঠে ! অর্থের সাহায্য চাওয়াই হচ্ছে ভালবাসার সব চেয়ে বড় শত্রু ! এই যে, আমার বাড়ীর কাছেই এসে পড়েছি। এসো, একটুখানি ব'সে বিশ্রাম করে' যাও।

ঘরে ঢুকে চেয়ারখানা সরিয়ে দিয়ে একটা মাদুর আনতে দ্বিজেন ভিতরে গেল। অজয়া তৎক্ষণাৎ একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে মুঠার ভিতর থেকে নূতন গোটা দুই তামার মাদুলী ও ঠাকুরের প্রসাদী ফুল ও পাতা তাড়াতাড়ি আঁচলে বেঁধে ফেললো।

মাদুর এনে দ্বিজেন বল্‌ল—আমি এমন অবিবেচক নই যে তোমায় বসিয়ে রাখবো শুক্‌নো মুখে। ভেতরে খাবার ব্যবস্থা করে' এলাম। থাক, আর আপত্তি ক'রে পর বলে পরিচয় দিতে হবে না !

অগত্যা অজয়া চুপ করে' রইল।

খাওয়া দাওয়ার পর দ্বিজেন বল্‌ল—নিজেকে অপমান করবার পথ আর আবিষ্কার করে' বেড়িয়ো না, এই তোমার কাছে আমার মিনতি। তুমি স্বাধীন হয়ে স্বাধীনতাকে গ্রহণ করতে পারোনি। দেয়ালের গায়ে মাথা ঠুকে যে মেয়েরা আজ ছুটে বেরোতে চাইছে তাদের চেয়ে সুবিধে তোমার অনেক অজয়া। কিন্তু সে সুবিধে তুমি নিলেনা, তুমি পথে পথে বেড়াবে, কিন্তু পথ দেখালে না! তোমার মধ্যে যে-সম্ভাবনা ছিল, যে-কাজ তুমি কর্‌তে পার্‌তে, তার দিকে মুখ ফিরিয়েও চাইলে না। এ দুঃখ রাখি কোথায় বল ত?

অজয়া বল্‌ল—আমার কোনো শক্তি নেই।

এবার তা'হলে তর্ক ক'রে বোঝাতে হয়, তোমার শক্তি আছে। তাতে তর্কই হবে শুধু।

অসহিষ্ণু হয়ে দ্বিজেন বল্‌ল-নিজেদের অশ্রদ্ধা করবার এই যে মজ্জাগত প্রবৃত্তি তোমাদের, এর থেকে কোনদিন নিষ্কৃতি নেই। স্ত্রীলোকই হচ্ছে স্ত্রীলোকের সবচেয়ে বাধা এবং শত্রু। আজ পর্য্যন্ত যেটুকু তোমাদের উন্নতি হয়েছে, সেটুকু তোমরা নিজেদের থেকে ওঠোনি, আমরাই টেনে তুলেছি।

অজয়া বল্‌ল—এখানে বসে' বসে' আপনার সঙ্গে কি কেবল ঝগড়াই করতে হবে?

কাঁচা ঝাঁঝালো বক্তার মতো দ্বিজেন চেঁচিয়ে উঠল,—না, ঝগড়াও নয়, মনান্তরও নয়; তোমরা শুধু জানো গরুর মতো গিল্‌তে, শুধু জানো সৃষ্টিকার্য্যের সহায় হতে। কী তোমরা? হৃদয়ের ধার ধারো না, প্রাণের খোঁজ পাও না, জ্ঞান-বুদ্ধির মানে জানো না—রক্ত মাংস স্থূল দেহের স্তূপ, চোখ বুজে' দিন-যাপনের গ্লানিকে এড়িয়ে চলো, অনড় আরামের দাসী, জানোয়ারের জঘন্য জীবনযাত্রার সঙ্গী!

এমন ক'রে হাঁপাতে লাগলো যে অজয়া একটুখানি না হেসে থাক্‌তে পার্‌ল না! বল্‌ল—আর কত গালাগালি দেবেন?

তা বটে! দেখতে দেখতে সহজ হয়ে এল দ্বিজেনের মুখখানা, বল্‌ল—একটু হেসেই বল্‌ল—তোমাকে দেখলে এই কথাগুলো মাথার মধ্যে ভিড় করে। ভাবলাম অনেকদিন বাদে একটু গল্প করব তোমাকে নিয়ে, কিন্তু আজকাল গল্প বলতে গেলেই আসে বক্তৃতা। সত্যি অজয়া একবার ভেবেই দেখ না, জীবনে কি তোমার কোন কাজ নেই? এমনি পুঁটুলি হয়ে তোমরা আর কত দিন কাটাবে বল ত? এ দেশের ছেলেরা আর বিয়ে করতে চাইছে না কেন জানো? তোমাদের বিয়ে করা তাদের অপমান। তোমরা এতই পিছিয়ে, এতই নিচু যে তারা মনে করে তোমরা বোঝা, তোমরা তাদের বাধা! তাই তোমাদের তারা পায়ে থেঁথলায়, অত্যাচার করে, মরবার পথ ক'রে দেয়।

আর বসবার সময় ছিল না অজয়ার। আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়ালো। দ্বিজেন বলল—অনুরোধ আর করব না যে তুমি আর একটু বসো। কিন্তু স্বীকার ক'রে যাও পয়সার সাহায্য আর তুমি চাইতে যাবে না! তোমার স্বামী নেই, সন্তান নেই, আপনার লোক কেউ নেই—যদি কিছু না পারো উপবাস ক'রে থেকো, এমন ক'রে নিজের মুখ আর খুড়িয়ো না! শৈলেনের কাছে দয়া নিয়ে নিজেকে দুশ্চরিত্রা ব'লে আর স্বীকার করো না!

কি যে বলেন আপনি!—বলে' মুখ রাঙা করে' অজয়া পা বাড়াচ্ছিল, দ্বিজেন পুনরায় বল্‌ল—আর এক কথা, সরোজিনী দেবীর ওই যে 'নারী শিল্পাশ্রম'টার কথা সেদিন তোমায় বলেছিলাম তার কি কর্‌লে?

মুখ তুলে অজয়া বল্‌ল—বলুন কি করব?

কাজে না হয় পরে নামবে, আমার সঙ্গে একদিন ওখানে যাবে যে বলেছিলে? তোমার মতন বেপরোয়া মেয়ে পেলে তাঁরা মাথায় করে' নেবে। নিজের অবস্থা তুমি সহজেই ফিরিয়ে নিতে পারবে। বল, কবে যাবে?

অজয়া বল্‌ল—যেদিন বল্‌বেন।

এ তোমার ভাসা ভাসা কথা। দিব্যি কর।

দিব্যি করে' যদি না রাখি?

তাও তোমরা পারো। মেরুদণ্ড বলে' যে কোন পদার্থ তোমাদের আছে এ কথা কেউই বিশ্বাস করবে না। তোমাদের জীবনে গভীরতাও নেই, দায়িত্ববোধও নেই! হাজার হোক, বাঙালীর মেয়ে ত! কাল একবার আস্‌বে দুপুর বেলায়? - ওগুলো কি, আচ্ছা ভালই হয়েছে, ঠাকুরের ওই পেসাদী ফুল-পাতা ছুঁয়ে দিব্যি করে' যাও—আস্‌বে!

আমার ভাল করবার জন্যে আপনি একেবারে পাগল হয়ে উঠেছেন দেখছি। নিন্—দেখুন, এই ছুঁলাম,—আস্‌বো, আস্‌বো!—বল্‌তে বল্‌তে তাড়াতাড়ি অজয়া রাস্তায় গিয়ে নাম্‌ল।

গাছ-পালায় তখন রোদ উঠেছে!

দ্বিজেন এগিয়ে এসে দাঁড়ালো বারান্দায়। আজ আর অজয়া ডান দিকে গলির বাঁকে ফিরলো না, সোজা চল্‌তে লাগলো। পিছন দিকে একটিবারও সে ফির্‌ল না, কারণ পিছনে তাকাবার মেয়ে সে নয়। এদিকে ওদিকে কোনদিকেই সে চায় না, নিজের পথটাই হচ্ছে তার পক্ষে সত্য। হেলে দুলে, মাথায় অল্প একটু ঘোম্‌টা টেনে দিয়ে অবেলার ম্লান আলোয় তার দেহটি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হঠাৎ দ্বিজেনের মনে হল' যে-কটূক্তি, যে-লাঞ্ছনা এতক্ষণ সে করল এ তার মনের কথা নয়, এসব তার অন্তর থেকে উৎসারিত হয়নি।

প্রশংসা করতে গিয়ে তার মুখ থেকে নিন্দা বেরিয়ে পড়েছে। কই মেয়েদের সে ত অবজ্ঞা করে না!

ভিতর থেকে তার একটি গভীর নিশ্বাস উঠে যেন অদৃশ্য অজয়ার পিছু পিছু ছুটতে লাগ্‌ল।

সেকি অজয়াকে ভালবাসে?

কাল আসব বলে' গেছে। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই।

আর তার দেখাই নেই। কাল-ও আর এল না!

এল না যখন, তখন পথ চেয়ে বসে' থাকাও আর চল্‌লো না। দ্বিজেনের অনেক কাজ। সে ডাক্তারী করে, কংগ্রেসের চাঁদা তোলে, সভা-সমিতিতে যায়-আসে, কর্ম্মীসঙ্ঘের সে সভ্য, নারী-শিল্পাশ্রমের সে ডিরেক্টর। একজনের জন্য অপেক্ষা করে' থাকার সময়ই তার নেই।

কাজের চাপে অজয়াকে ভুলতেও তার দেরী লাগ্‌ল না।

রাজনীতি এই সময়টা তখন প্রবল আন্দোলন তুলেছে। ঘরে ঘরে তখন এ ছাড়া আর কথা নেই। চারিদিকে তুমুল সাড়া পড়ে' গেছে।

কলকাতা থেকে সংবাদ এল, মেয়েরা কাজ কর্‌তে নেমে নাকি ধরা পড়েছে। খবরটা এখানকার ঘরে ঘরে দিল আগুন লাগিয়ে।

গোপনে যে মেয়েরা সঙ্কোচের সঙ্গে নেমেছিল পথে, তারা আর ভয় মান্‌ল না। চাঁদার খাতা বেরোল, দল তৈরী হ'ল, যোগমায়া দেবীর নেতৃত্বে এক দল মেয়ে বেরিয়ে পড়ল বাড়ী বাড়ী চরকা এবং খদ্দর প্রচারের উদ্দেশ্যে।

হৈ চৈ হ'ল্‌ সুরু। রাস্তা ঘাটে জম্‌লো জটলা; বৈঠকখানা, তাসের আড্ডা, গানের আসর ফেলে সবাই ছুটে এল এই আজব কাণ্ড দেখতে। সহরের নাড়ীটা হয়ে উঠল চঞ্চল।

'বন্দে মাতরমের' আওয়াজে দিন রাত সহরটা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

মালিনী গুপ্তা, মহামায়া মিত্র প্রভৃতি এসে বললেন—মেয়ে কই ডাক্তারবাবু?

দ্বিজেন বলল—বাড়ী বাড়ী ক্যান্‌ভাস্ করতে হবে, মেয়ে বা'র করা চাই।

পাওয়া যাবে?

যেতেই হবে। বিরজা দেবীকে পাঠাবো। তিনি বেশ 'চার্ম্' করতে পারেন। 'সিচুয়েশন' বুঝিয়ে দিলে অনেক মেয়েই আস্‌বে।

তাই ঠিক হলো। বিরজা দেবী এলেন। স্বামীপরিত্যক্তা মেয়ে,—টক্‌টকে চেহারা, বয়স আন্দাজ বছর পঁচিশ, কিয়ৎ পরিমাণে পুরুষ-বিদ্বেষী! দ্বিজেন বল্‌ল—একাই যাবেন? অবশ্য জন দুই মেয়ে থাকবেন আপনার সঙ্গে।

বিরজা বললেন—আপনি ডিরেক্‌টর, কাছে কাছে থাক্‌লে ভাল হত, 'এমারজেন্সীর' জন্যে!—চশমার ভিতরে তিনি হাসলেন।

আচ্ছা মাঝে মাঝে থাক্‌বো!—মনে রাখবেন, মেয়েদের এ মুভ্‌মেণ্ট্‌কে আর থাম্‌তে দেওয়া হবে না। মিটমিটে যে আলোটি আমরা জ্বেলেছি, এইটি দিয়েই সব ঘরে আলো জ্বালাবো!

সময় বড় অল্প। জন দুই মেয়ে নিয়ে বিরজা দেবী বেরিয়ে পড়লেন দুপুর বেলায়। ডাক্তারবাবুও চললেন সঙ্গে সঙ্গে।

ছেলে আর মেয়েকে একসঙ্গে কাজে নামতে দেখে গঙ্গার ঘাটে বৈকালিক বৈঠকে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের নিন্দার বান ডাক্‌তে লাগ্‌ল।

দিনতিনেকের মধ্যেই যোগাড় হ'ল গুটি পচিশেক মেয়ে। অবশ্য বিরজার কৃতিত্বই বেশী। দ্বিজেন লাহিড়ী প্রশংসার দিকে পিছন ফিরে থাকে।

দুপুর বেলা। কারণ দুপুর বেলাই মেয়েদের পক্ষে কাজের সুবিধে।

বিরজা বললেন—কাল যাননি, আজ আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে।

বেশ, আফিসে বেলা ছুটোর সময় আপনাদের সঙ্গে মিট্ করবো।

সেদিন আফিসে তার অপেক্ষায় মেয়েরা বসেই রইল। বেলা আন্দাজ আড়াইটের পর ছুটতে ছুট্তে দ্বিজেন এসে বল্ল—শিগ্‌গির আসুন একবার আমার সঙ্গে!

মেয়েরা ঝড়ের আগে দৌড়য়। সবে মিলে পথে নেমে বল্‌ল—কোন্ দিকে?

আসুন ত!

'গলি-ঘুঁজি, দোকান-পসারি পার হয়ে শিবমন্দিরের পাশে সোজা রাস্তাটা ধরে' একটি সংকীর্ণ আলো-বায়ু-লেশহীন অন্ধ গলির কাছে থেমে দ্বিজেন বল্‌ল—এর মধ্যে ঢুকে যান্, ঠিক্ কোন্ বাড়ীটা হবে বলতে পাচ্ছি না।

মেয়েরা সবাই অনভ্যস্ত, পথশ্রমে হাঁপাচ্ছিল। বল্‌ল, কার কাছে?

আমারই একটি পরিচিতা মহিলা। একটু আগে এই গলির মধ্যে তাড়াতাড়ি ঢুকেছেন। ভাল করে' বললে আসতেও পারেন আমাদের দলে! প্রথমে আমার নাম করবেন না কিন্তু।

বিরজা বললেন—আপনিও আসুন?

না—বলে দ্বিজেন মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

বিকট দুর্গন্ধময় সঙ্কীর্ণ পথ। কিন্তু গলির মধ্যে ঐ একটি মাত্রই দরজা। মালিনীকে বাইরে রেখে খানিকদূর চলে গিয়ে বিরজা কড়া নাড়িল।

অবরুদ্ধ জীর্ণ গৃহকোণ থেকে আওয়াজ এল—কে?

উপর থেকে দরজায় লাগানো একটা দড়িতে টান পড়তেই দো'র

গেল খুলে। বিরজা ভিতরে ঢুকলেন। নীচেকার আবহাওয়ায় জানোয়ারও বাস করতে পারে না। ঝুপ্‌সি অন্ধকার, কন্‌কনে ঠাণ্ডা, পচা ইট-কাঠের গন্ধ,—ভয়াবহ জীর্ণতার রূপ। বাঁ হাতি সিঁড়ি ধরে' বিরজা সোজা উপরে উঠে গেল। সঙ্কোচের চেয়ে কৌতূহল তার চোখে বেশী।

গিয়ে দাঁড়াতেই অজয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। হেসে ছোট একটি নমস্কার করে' বলল—আসুন।

আস্‌তে বল্‌ল, কিন্তু বসাবে কোথায় ? একটি মাত্র ঘর ছাড়া যেটুকু জায়গা আছে, সেখানে জঞ্জাল, ছেঁড়া নোংরা কাপড়ের টুক্‌রো, জল প্যাচ প্যাচ করছে, ই দুরে এক জায়গায় তুলেছে রাবিশ, ও দিকে এঁটো-কাটা !

বিপন্নের মতো কয়েক মুহূর্ত এদিক ওদিক তাকিয়ে অগত্যা অজয়া বল্‌ল—আচ্ছা, তবে ঘরেই আসুন ! ওঁর বড্ড অসুখ বেড়েছে কিনা, তাই বলছিলাম।

ঘরে ঢুকে বিরজা দেখল একটি . পাশে এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ নিমীলিত দৃষ্টিতে বিছানার সঙ্গে মিশে রয়েছে। খড়ের মতো পাকা দাড়িগোঁফে মুখখানা ঢাকা। বয়স পঞ্চাশও বটে, সত্তরও বটে। কাছে কতকগুলো ওষুধের শিশি, তুলো, ওপাশে কতকগুলো কাগজের ছাই, পোড়া দেশালাইয়ের কাঠি, থুথু ফেলার পাত্র ইত্যাদি। ঘরের ভিতরে চারিদিকে একবার তাকিয়ে বিরজা শিউরে উঠলো মনে মনে।

অজয়া তাড়াতাড়ি গিয়ে বৃদ্ধের কাছে বসে তার গায়ে ভাল করে' কাপড় ঢাকা দিয়ে দিল। বল্‌ল—বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন। একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, ভাল করে দেখতেও পান না।

বিরজা বিশ্বাস করতে পাচ্ছিল না। বল্‌ল—কে ?

অজয়া ক্লান্ত হাসি হাসবার চেষ্টা করল। তারপর বৃদ্ধের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌ল—বলুননা আপনি যা বলেন, কানে উনি একটু কম শোনেন।

বিরজা যেন ছোট হয়ে গিয়েছিল। থতিয়ে থতিয়ে বল্‌ল—এসেছিলাম··· এই আপনার কাছেই।

কম্পিত দুটি হাত তুলে বৃদ্ধ কি ইঙ্গিত করল। অজয়া হেঁট হয়ে বল্‌লে—পিঠে লাগছে বুঝি?—ব'লে জড়িয়ে ধ'রে সে বৃদ্ধকে কোলে তুলে নিলে। আঘাত একটু লাগল বোধ হয়। মুখ বিকৃত ক'রে লোকটি নিতান্ত নিম্পরের মতো কটূক্তি করে' উঠ্‌ল।

আঁচল দিয়ে তার দুটি চোখ মুছিয়ে দিয়ে অজয়া বল্‌ল—এমনি খিট্‌খিটে হয়ে গেছেন, ভারি রোগ কি না!—তার পর আবার মাথা হেঁট করে' বৃদ্ধের কানের গোড়ায় মুখ রেখে বল্‌ল—ভয় কি, ভালো তুমি হবেই। আমাকে কি গালাগাল দিতে আছে? একেই একটু রুক্ষ মানুষ, তার ওপর অসুখ করেছে, ওঁর আর দোষ কি!

লোকটির কপালের উপরে গাল পেতে অজয়া অনুভব করে' বল্‌ল—জ্বর বোধ হয় একটু কমেছে। কাল রাতে জ্বরের যাতনায় কি আর ওঁর জ্ঞান ছিল? ··এপাশ ওপাশ—সমস্ত রাত আমিও জেগে রইলাম! —ক্ষিধে পেয়েছে? শুন্‌চ, ক্ষিধে পেয়েছে তোমার?

গরম দুধ ঢাকা ছিল, ঝিনুকে করে' দুধ নিয়ে পরম যত্নে অজয়া তাকে খাওয়াতে লাগল। দুধ খাইয়ে মুখ মুছিয়ে সে আঁচল দিয়ে হাওয়া করতে সুরু করলে।

বিরজা আস্তে আস্তে বল্‌ল—বিয়ে হয়েছে কতদিন?

অজয়া ম্লান হাসি হাসল। বল্‌ল—বিয়ে হলে ছেড়ে যাওয়া চল্‌ত, কিন্তু—এ কি আবার বমি করছ যে?

আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে বিরজার দিকে তাকিয়ে সে পুনরায়

বল্‌ল - ছোট ছেলের মতন! রাগ করেন অথচ আমাকে, নৈলেও চলে না! এমন মানুষ দুনিয়ায় আমি দেখিনি ভাই!

দেশের কাজে টান্‌বার কথা বিরজা ভুলেই গিয়েছিল। মৃদু কণ্ঠে বল্‌ল—আপনার রান্নাবান্না হয়নি?

অজয়া আবার একটু হাসল, বল্‌ল—দিনের আলো থাকতে কি আর···মেয়েমানুষের শরীর, সবই সয়।

আচ্ছা আজ তাহলে আসি!

যাবেন? আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারলাম না! দাঁড়ান, দরজা পর্যন্ত আপনাকে···

ব্যস্ত হবেন না, একাই যেতে পারবো! আর একদিন এসে বরং কথাবার্ত্তা কইবো।—বলতে বলতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বিরজা নীচে নেমে এল।

দরজার কাছে এসে এই সকরুণ অন্ধকারের মাঝখানে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ঠোঁট দুটি কেঁপে ঝর ঝর করে চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। অশ্রুজলের অনির্বচনীয় আবেগে তার বুকখানি ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। বল্‌ল, আশীর্ব্বাদ ক'রে যান্ ওঁকে রেখে যেন আমার মৃত্যু হয়।

চোখ মুছে বিরজা বাইরে আসতেই দ্বিজেন বল্‌ল—কি বললে? এল না?

বিরজা বলল—না, ওঁর পক্ষে দেশের কাজ করা সম্ভব নয়!

মালিনী বলল—কেন? সম্ভব নয় কেন?

অত্যন্ত স্বার্থপর মেয়ে!—আসুন ডাক্তারবাবু।—বলে' বিরজা নিজেই এগিয়ে চল্‌ল।

পূরবী

পশ্চিমে পাহাড়ের চূড়াগুলি এরই মধ্যে কখন লাল হ'য়ে উঠেছে। জানালা দিয়ে গোধূলির আলো প্রবেশ করে' ঘরের সমস্ত আসবাব-গুলি একপ্রকার রঙীন দেখাচ্ছিল।

খবরের একখানি কাগজ মুখের সুমুখে ধরে' রায়-সাহেব মুখ টিপে একটু হাসছিলেন। বয়স তাঁর পঞ্চাশের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু বয়সের কথা সব সময় তাঁর মনে থাকে না। সুন্দর সুপুরুষ! মাংসপেশীবহুল সর্ব্বাঙ্গে বয়সোচিত একটি গাম্ভীর্য্য এসেছে। চুলগুলি একটু পাতলা হ'য়ে গেছে—হঠাৎ মনে হতে পারে মাথায় তাঁর টাক পড়তে আর বুঝি বিলম্ব নেই। অদূরে জানলার ধারে অনেকক্ষণ থেকে সুমুখে পুরু একখানি কাগজ রেখে হাতে একটি তুলি ধরে' নিরুপমা বসে' বসে' কি ভাবছিল। মাথায় কাপড় নেই, যে বয়সের মেয়ে তাতে সিঁথিতে সিঁদুর থাকা উচিত,—তাও না। কপালের কাছে চুলগুলিতে আলো পড়ে' ঈষৎ তাম্রবর্ণ হ'য়ে উঠেছিল। চোখের দুটি পাতা সকল সময় মনে হয় যেন জলে ভিজা,—বর্ষণক্ষান্ত উষার মতো। ঘনকৃষ্ণ দুটি আঁখিতারার নিবিড় বিস্ময় ও কৌতূহল একই সঙ্গে কোলাকুলি করে' থাকে। সর্ব্বদাই সে-দুটি চোখ যেন কি একটি বস্তু খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং পাবামাত্রই তাদের বিস্ময়ের যেন আর সীমা নেই।

মুখ ফিরিয়ে চেয়ে হঠাৎ নিরুপমা বলল—দুষ্টু! [illegible]লো না, চোখদুটিই যেন সব কথা বলে' দিতে পারে!

কাগজটা মুখের উপর সম্পূর্ণ আড়াল করে' রায়-সাহেব আবার হেসে বললেন—আমি ত তোমার দিকে চাইনি, নিজের মনেই হাসছি।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে' নিরুপমা বসে' রইল; পরে তুলিটা রেখে

দিয়ে উঠে এসে রায়-সায়েবের গলা জড়িয়ে ধরে' বলল—রাগ কল্লে মেসোমশাই? ওই যে তোমায় দুষ্টু বললাম?

রায়-সায়েব বললেন, রাগ! হুঁ খুব। নতুন রায়-সাহেব হইছি, আজকাল একটু বেশি রাগ না দেখালে মানায় না! পরে নিরুপমার হাতের উপর একটু হাত বুলিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন—অনেকদিন হ'ল তোর কাছে আছি, রাগের বালাই কি আমার আজও আছে রে?

তাঁর কাঁধের উপর মুখ রেখে নিরুপমা বলল—ছবি-টবি আঁকা আমার দ্বারায় হবেনা মেশোমশাই, শুধু আকাশটাই আঁক্‌তে পারি, আর কিছু না। আচ্ছা, এমন কেন হয় বলত? আমার মনে হয় কেউ আমার চেয়ে ভাল ছবি আঁকতে পারে না, কিন্তু যেই তুলি নিয়ে বসি অমনি—

রায়-সাহেব আবার একটু হেসে তার গালের উপর হাত বুলিয়ে বললেন—আর গান? সে কথা ভুলে যাচ্ছিস যে দুষ্টু মেয়ে?

নিরুপমা একটুখানি হাসলো। পরে বলল—আচ্ছা মেসোমশাই—?

কি মা?—চুপ করলি যে?

সে কথা শুনলে তুমি হাসবে কিন্তু।—আচ্ছা যে-গান লোককে মিথ্যে মিথ্যে কাঁদায়, সে-গান তোমার ভাল লাগে না?

রায়-সাহেব বললেন—মত প্রকাশ করলে সেই লোকেরাই যে তেড়ে আসবে।—এবার চল্‌ মা, সন্ধ্যে হ'য়ে এল, পাহাড়ি রাস্তায় এর পর বেড়াবার স্থবিধে হবে না!

দাঁড়াও, তুমি উঠতে পাবে না কিন্তু। আমি আসি আগে।

পাশের ঘরে গিয়ে নিরুপমা শুধু সাড়ীটা বদ্‌লে এল। আয়নার কাছে গিয়ে মাথার চুলটা একবার ঠিক করে' নিল। রায়-সাহেব তেমনিই শান্ত ছেলেটির মতো বসেছিলেন; নিরুপমা তাঁর সার্টের

উপর কোটটা পরিয়ে দিয়ে বোতাম বন্ধ করে' দিল। চিরুণী বুরুষে চুলগুলি দিল বিন্যাস করে'। সিগারেটের কেসটা দিল পকেটের মধ্যে। মনি-ব্যাগটাও রাখলো। মাটিতে বসে' জুতোর ফিতে বেঁধে দিল। এবং শেষকালে নিজের মোজার উপর ঘুন্টি-বাঁধা জুতোটা পরে' নিল।

পাহাড়ের চূড়ায় বাঁধা ছোট্ট শহরটি। মানুষের বসতি এর চেয়ে আর উঁচুতে উঠতে পারেনি। নীচে অপরিসীম গভীরতা; দিন থাকতেও দিনের আলো পূর্ব্বেই সেখানে অবসন্ন হ'য়ে আসে।

পাহাড়ের মায়া চিরকালের জন্য নিরুপমার চোখে জাল বুনেছে। এদিক থেকে ওদিকে ঘাড় ফিরিয়ে প্রতিক্ষণেই এত বড় আকাশটিকে সে একবার করে' দেখে নেয়। নীচে প্রশান্ত দিক্‌বলয়টাকে ঘিরে শুধু অরণ্যবহুল কতকগুলি ছায়ামূর্ত্তি পর্ব্বত-চূড়া! মাঝে মাঝে ক্ষীণকায়া কয়েকটি গিরি-ঝরণা! দেখে মনে হয় সে নিজেই যেন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, নিজেকে ধরে' রাখবার খেই তার নেই!

চলতে চলতে দুজনে কথা হয় –

আচ্ছা মেসোমশাই, এমন দেশ আছে যেখানে পাহাড় নেই?

আছে বৈ কি মা, আমাদের বাংলা দেশ!

বাংলা দেশ? পাহাড় নেই সেখানে! সে কোনদিকে মেসোমশাই?—

রায়-সাহেব বললেন—সমতল বাংলা। সবুজ গ্রাম দিয়ে ঘেরা, কোলে কোলে নদী। অশথ গাছ ঝুলে পড়ে নদীর স্রোতের ওপর। বটের ছায়ায় তুলসীতলা—মেয়েরা সেখানে পিদিম দেয়! তুই ত জীবনে যাস্‌নি সেখানে, জানবি কেমন ক'রে?

চোখ দুটি নিরুপমার ঢুলে আসে। পরক্ষণেই বড় বড় চোখে চেয়ে বলে—তারপর মেসোমশাই!

তারপর? তারপর শালিকে আর বুলবুলিতে সোনার মাঠে চরে' চরে' ধান খেয়ে যায়। দেবদারুর ডালে বসে' ঘুঘু ডাকে, বিলের ধারে বক আর মাছরাঙা উড়ে বসে। আকাশের চাতক বলে' ফটিক জল!— রায়-সাহেব একটু হাসলেন।

মেসোমশাই, এ কি সত্যি?

আরো আছে মা! নববর্ষার দিনে কদমগাছের তলায় ময়ূরে পেখম মেলে দেয়! গুরু গুরু মেঘ ডাকে, দিঘীর জলের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে, আর ভীরু মেয়েরা বাঁশবনের অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে, তাদের বুক কাঁপে!

ও।—নিরুপমা বিস্ময়ে মুখ তুলে চায়।

আর আছে মুখর নারকেল-বন। বাংলার কোলে মাথা রেখে নীল সাগরের মধ্যে সে পা ছড়িয়ে আছে।

সাগর? সাগর তুমি দেখেছ মেসোমশাই? নীল জল?

পর্ব্বতের রাজ্য ছাড়া এ জগতের সবই যেন তার কাছে বিস্ময়! সমস্তই অপরিচয়ের রহস্য দিয়ে ঘেরা।

রায়-সাহেব বললেন—সেই নীল জলের ওপার থেকে আসে মলয় হাওয়া, সে হাওয়া ভারতের আর কোথাও নেই। সেই হাওয়াতেই ত আমাদের বাঙলায় রজনীগন্ধা ফোটে, বকুলের কুঁড়ি আর শিউলি!

মেসোমশাই, এ সব কথা তুমি ত কোনোদিন বলনি?—আনন্দের উচ্ছ্বাসে নিরুপমার চোখদুটি ঝাপসা হ'য়ে আসে। পাতলা দুখানি চকচকে ঠোঁট তার একটু একটু কাঁপে; ভিতর থেকে ডালিম দানার মতো দাঁতগুলি দেখা যায়।

বলে—কোন্ দিকে মেসোমশাই, আমাদের সেই বাঙলা দেশ?

হাত বাড়িয়ে রায়-সাহেব দেখিয়ে দেন। ওই দূরে, দেখছিস?

ওই যে মাটির তলা থেকে একটি তারা ফুটে উঠ্ছে আকাশের কিনারায়, ওই দিকে বাঙ্লা!

ওই দিকে? আমি মনে করেছিলাম বুঝি পশ্চিমে, সূর্য্য যেদিকে অস্ত যাচ্ছে।

না, ওদিকে পাঠান দেশ—কাবুল। ওদিকে আসে যুদ্ধের চীৎকার ডাকাতি, লুট-তরাজ, ওদিকে মানুষে মানুষে কামড়া-কামড়ি! খুনোখুনি!

মুখ তুলে নিরুপমা আবার ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে' তাকায়। দুই চোখে তার অসহায় অদম্য কৌতূহল আবার স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। বলে —যুদ্ধ? খুনোখুনি? মেসোমশাই, তাদের কি এতটুকু দয়া মায়া নেই!

বঞ্চিত হতভাগ্য সেই পশ্চিমের মানুষদের প্রতি অপার করুণায় তার চোখদুটি আবার ছোট হ'য়ে আসে।

রাত্রির নির্ব্বাক্ নিঃশব্দতায় ঘরখানি আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

শোফায় হেলান দিয়ে রায়-সাহেব গড়গড়ার নলটা এক-একবার টানেন। এবং তাঁর মুখোমুখি একখানি আরাম-কেদারায় বসে' নিরুপমা ইংরেজি খবরের কাগজখানি নাড়াচাড়া করে। টিপয়ের উপর আলোটা জ্বলে। মেয়েটির মুখে কোন রেখা নেই, চোখে যেন সেই শৈশব কালের সরলতা,—আনন্দ-বেদনার কোন দোলা সে মুখে নেই! প্রদীপের আলো সে মুখের উপর যখন পড়ে, মনে হয় সেখানে বর্ষণ-পাণ্ডুর আকাশের আভাস আছে, পর্ব্বত-কান্তারের রিক্ততা আছে, গোধূলির আলো আছে, আর আছে অরণ্যের নিবিড় ছায়া! মানব-ধর্ম্মের আর কোনো ইঙ্গিত কি সে মুখে আছে?

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রায়-সাহেব বললেন—তারপর নিরু'মা ?

খবর ?—নিরুপমা বল্‌ল—তেমন খবর আর—ওঃ, আর একটা আছে মেসোমশাই, দাঁড়াও বল্‌ছি।

সীমান্ত-প্রদেশে একটি নারী-হরণের সংবাদ! স্পষ্ট দিবালোকে অন্দরের নিরাপদ আশ্রয় থেকে একটি সুন্দরী মহিলাকে মুখ বেঁধে ভয় দেখিয়ে দস্যুরা চুরি করে' নিয়ে গেছে! এখনও তার কোনো তল্লাস পাওয়া যায়নি।

হাত কেঁপে কাগজখানা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো! সহসা কে যেন তার গলার টুঁটি টিপে ধরেছে। অস্ফুট ক্লান্ত কণ্ঠে সে শুধু বলতে পারলো, মেসোমশাই ?

রায়-সাহেব চোখ বুজে একটুখানি ক্ষীণ হাসি হাসলেন। বললেন—কি মা ?

স্ত্রীলোককে চুরি করে' নিয়ে গেল! মানুষ মানুষকে চুরি করে ?—বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বাইরের কালো আকাশের দিকে চেয়ে সে আবার বল্‌ল - মেসোমশাই, চুপ করে' আছ যে ? তুমি বুঝি আশ্চর্য্য হওনি ? এ কি তাদের পাপ নয় ?

রায়-সাহেব বল্‌লেন—মানুষে এর চেয়েও বড় পাপ করে নিরু' মা!

এর চেয়েও ? ও।—নিরুপমার কম্পিত দুটি দৃষ্টি ছলছল করে' আসে। এবং আরও কিছু বলতে গিয়ে তার আওয়াজ রুদ্ধ হ'য়ে আসে।

সংসার যেন তার চোখে দুর্ভেদ্য অজ্ঞতায় ভরা। আকাশের মেঘ আর পথের ধূলো দুইই তার কাছে সমান জটিল এবং পরম রহস্যময়!

দিনের বেলায় সে যা শোনে এবং ভাবে, রাত্রে তাই আবার স্বপ্ন দেখে। সেদিন দেখলো চারিদিকে যেন তার কোলাহল করে'

উঠেছে। ভয়ার্ত্ত ভয়ের তাড়নায় পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নেই। মদমত্ত বলদৃপ্তের পরস্পর হানাহানি, যুদ্ধ, মারি-মড়ক, মন্বন্তর! আর দেখলো বহুদূরে—হয়ত এ পৃথিবীর বাইরে, একখানি শস্য-শ্যামল ছায়া-শীতল ভূমিখণ্ড! উৎপীড়িত মানবজাতির প্রলোভনের মতো,—সেখানে বন-বনান্তের বসন্তশোভা, হরিৎক্ষেত্রে হরিণের দল ছুটছে, আর বুলবুলিতে খেয়ে যাচ্ছে ধান, তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে লাজুক ভীরু মেয়েটি প্রণাম করছে! এমন সময় এল মূর্ত্তিমান নির্ম্মম দস্যুতা, ঝড়ে গেল আলো নিবে, দয়াহীন কঠিন বাহু দিয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে মেয়েটিকে টেনে নিয়ে গেল। নদ-নদী প্রান্তর পার হ'ল! তারপর···

তারপরেই তন্দ্রা ছুটে গেল। বেতস পত্রের মতো সে তখন থর থর করে' কাঁপছে। পদ্ম-পলাশের মতো চোখ দুটি তখন তার সত্যি ই ভয়বিহ্বল হয়ে' উঠেছে। আর একটু হ'লেই সে হয়ত চীৎকার করে' উঠতো। কম্পিত রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকলো—মেসোমশাই?

কি মা?

তাড়াতাড়ি নিরুপমা উঠে দাঁড়ালো। বল্‌ল—অ্যাঁ, তুমি জেগে ছিলে এতক্ষণ? আমি মনে করি বুঝি—

একটু হেসে রায়-সাহেব বললেন—জেগে আছি শুধু ত আজ নয় মা, বহুদিন থেকে তোর মাথার কাছে এমনি করে'ই জেগে আছি! ভয় হয়েছিল বুঝি নিরু'মা?

অপরিসীম শ্রদ্ধায় এবং কৃতজ্ঞতায় নিরুপমার গলা বুজে এল। কাছে গিয়ে হেঁট হ'য়ে তাঁর কপালের উপর মাথাটি রেখে গলা জড়িয়ে ধরে' গদগদ কণ্ঠে বল্‌ল - তুমি আমার জন্য অনেক করেছ মেসোমশাই। আমার জন্যে তুমি—

এমন সময়ে বাড়ীর নীচের দিকে পাথর-বাঁধানো গড়ানে রাস্তাটা—

যেটা অনেক দূরে গোরস্থানের কাছে গিয়ে মিশেছে—সেখানে এক-সঙ্গে অনেকগুলো জুতোর শব্দ স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো।

মুখ তুলে নিরুপমা বল্‌ল কে ওরা মেসোমশাই? এত রাতে …অন্ধকারে…

এ পথ দিয়ে ওরা রোজই যায় মা।

রোজ যায়? দেখি ত'। উঠে গিয়ে নিরুপমা জান্‌লার কাছে দাঁড়ালো।

পথের মুখে একটা সরকারী গ্যাসের আলো জ্বলছে। গলা বাড়িয়ে সেই দিকে তাকিয়ে ভীত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে বলতে লাগলো মেসো-মশাই, ওরা সব গোরা সৈন্য, হাতে সকলের এক একটা টর্চ্চের আলো—

অ্যাঁ, সকলের সঙ্গেই যে এক একটি মেয়ে! স্ত্রীলোক সঙ্গে নিয়ে এত রাতে…এবং তারপর হঠাৎ কি যেন লক্ষ্য ক'রে লজ্জায় দুহাতে মুখ ঢেকে নিরুপমা তাড়াতাড়ি সরে' এল। তার অপরাধই যেন সব চেয়ে বেশি!

মিনিট কয়েক নিঃশব্দে কেটে গেল। এক সময় মুখ ফিরিয়ে নিরুপমা বলে' উঠলো, তোমার কি কিছুই বলবার নেই, মেসোমশাই?

শান্ত, সংযত, সস্নেহ কণ্ঠে রায়-সাহেব বললেন—ওসব কিছুই নয় মা, ওরা অম্‌নি গোরস্থানের দিকে রোজই যায়! রাত অনেক হয়েছে, তুমি শুয়ে পড়গে। আচ্ছা থাক্, আমিই আলোটা নিবিয়ে দেবো'খন।

পুষ্প-স্তবকের মতো দুলতে দুলতে নিরুপমা গিয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো।

দিন কয়েক বাদে একদিন সকাল বেলা। ন'টা-দশটার সময়।

ডাক শুনে নিরুপমা বেরিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো! রায়-সাহেব বললেন—অতিথি এঁরা, কাশ্মীরের ফেরত দিল্লী যাবেন,

ও-বেলায় মোটর ছাড়বে। রাস্তা থেকে ধরে' নিয়ে এলাম নেমন্তন্ন করে'।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অল্পবয়সী। ঘোম্‌টা-টানা বউটি এসে নিরুপমার হাত ধরলো। স্বামীটির হাত ধরে' রায়-সাহেব বললেন—বহুভাগ্যে অতিথি মেলে, এসো ভায়া, ঘরে বসে' ততক্ষণ চা খাওয়া যাক্।

ঘরে-বাইরের অনড় নিবিড় শান্তিটা তবু যা হোক একটুখানি মুখর হ'য়ে উঠলো।

চমৎকার অতিথি! ঘণ্টাখানির দেরি লাগলো না সকলের সঙ্গে এক হ'য়ে মিশে যেতে। রায়-সাহেব বললেন না, না, কোনো লজ্জা নেই, সতীশকে ভায়া বলে' ফেলেছি, সুতরাং—তুমিও আমার সঙ্গে কথা কইবে সুলতা।

সুলতা লাজুক মেয়ে নয়। বল্‌ল—আজ্ঞে হাঁ, এইবার তাহ'লে মুখ ফিরিয়ে চলে যান, ভাসুরের সঙ্গে বাঙালির মেয়ে কথা কয় না।

সতীশ হো হো করে' হেসে উঠলো। নিজের সুন্দরী স্ত্রীর সম্বন্ধে তার একটুখানি দুর্ব্বলতা আছে; সচরাচর যা হ'য়ে থাকে। বল্‌ল—দেখলেন দাদা দেখলেন, ওর সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা শক্ত!

আত্মীয়তাটা যেন উভয় পক্ষের মনে লুকিয়ে ছিল।

রায়-সাহেব বললেন—তা হলে শোনো সুলতা দিদি, ভারিক্কে ভাসুর হ'তে গিয়ে আনন্দের পথ বন্ধ করতে চাইনে। সুতরাং মা বলাটা আপাতত স্থগিত রেখে দিদি চালাই। রাজি আছো তো ভাই?

খুব—বলে সুলতা হাসতে লাগলো।

তবে ভাই এ বেলা আমাদের পরিবেশন করে' খাওয়াও। বাঙলার লক্ষ্মী তুমি, তোমার হাতে বহুকাল অন্নগ্রহণ করা হয়নি।—

রান্না-বান্না চড়লো ; বেশ খানিকটা গোলমাল সুরু হ'য়ে গেল।

হাতে চুড়ি, তাগা, বালা, গলায় হার, কানে দুল, সীঁথিতে সিন্দুর, পরণে বেনারসী সাড়ী—তার পিছনে আছে গৃহস্থালীর মাধুর্য্য ; স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা।

নিরুপমা নিঃশব্দ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো। এরা যেন তার কাছে অপরিচিত মানব-মানবী। চোখ দিয়ে শুধু দেখতেই পারে কিন্তু মন দিয়ে আপনার বলে' গ্রহণ করতে পারে না।

হাত ধরে' সুলতা বল্‌ল—কি ভাই, কথা বলচো না যে ?

কথা ! কি কথা সে বলবে ? কেমন করে' আরম্ভ করবে ? কথা শুনে কথার উত্তর দেবে কি করে' ? সুলতার হাতের মধ্যে অবশ শিথিল হাতখানি তার একান্ত সঙ্কোচে কাঁপতে লাগলো। কম্পিত কণ্ঠে বললো—আমি জানিনে।

গলা ধরে' সুলতা বল্‌ল— বাঙলা কথা ত জানো ?

পিছন দিকে মাথাটা একটু সরিয়ে নিয়ে নিরুপমা বললো—হুঁ, আমি যা বলি সবই মেসোমশায়ের কথা, তিনি আমায় শিখিয়েছেন—

সুলতা ছাড়ে না। বলে—আমার কাছে তুমি চুপি চুপি নিজের কথা বলবে ত ?

নিজের কথা ?···সে কি ?

এমন সময় সতীশ এসে ঢুকলো। এদিক ওদিকে ঘাড় ফিরিয়ে বিস্ফারিত ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে নিরুপমা তার দিকে তাকালো। সুলতার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করলো না, অপরিচিত পুরুষের দৃষ্টির কাছে নারীসুলভ কোনো লজ্জাও তাকে স্পর্শ করলো না,—শুধু ভয়ব্যাকুলতার মর্ম্মান্ত উত্তেজনায় সুলতার দুটি নিটোল বাহুর মধ্যে বার বার তার সর্ব্বশরীর ঘেমে উঠ্‌তে লাগলো।

সতীশ বিস্ময়ে ও লজ্জায় আরক্ত মুখে সেই পথেই আবার বেরিয়ে চলে' গেল।

সুলতা তাকে ছেড়ে দিয়ে বল্‌ল—আশ্চর্য্য মেয়ে ত তুমি ?

সতীশের পথের দিকে নিরুপমা তেমনি করেই তাকিয়েছিল। এবার মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে সে বলল—খবরের কাগজ আপনি পড়েন ?…'নারী-হরণের' সেই খবরটা—

সে কথাটি বোধকরি আজও সে ভুলতে পারেনি। পুরুষ জাতির প্রতি তার বিতৃষ্ণা নয়—কেমন যেন একটা বিভীষিকা জন্মে গেছে!

কিন্তু সুলতা কিছুই জানে না। বল্‌ল—তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায় ভাই ? বাঙলা দেশে নয় বুঝি ?

ঘাড় নেড়ে নিরুপমা জানালো—না!

তোমার স্বামী ?…নেই ? ও—

রায়-সায়েব এসে ঘরে ঢুকলেন। কথাগুলি তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। বল্‌লেন—বিয়ে হয়েছিল ভাই একদিনের জন্যে। পরদিন বিধবা হয়ে…দশ বছরের মেয়ে! ভাবলাম ভাগ্যের ইঙ্গিত হচ্ছে আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় সত্যি!

নিরুপমা চেয়ে রইলো এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে। কোনো ঔদাসীন্যও নেই, বিষণ্ণতাও নেই,—নিজের জীবন সম্বন্ধে কোনো স্মৃতিই যেন তার মনে জাগে না!

রায়-সায়েব আবার বল্‌লেন—সেই থেকে বুঝলে দিদি, আমি ওকে ছাড়তে পারিনি। অনাথা বলে' নয়, আমি ছাড়া ওর কেউ নেই সে জন্যেও নয়,—ওকে আমি চিনি তাই জন্যে। ও আমার চিরকালের বন্ধু হ'য়ে গেছে।

সুলতার চোখে জল এল। নিরুপমা তেমনি করেই রায়-সায়েবের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখে তার যেমন মমতা, তেমনি অপরিমিত

শ্রদ্ধা! সে চোখদুটি প্রতিনিয়তই যেন অন্তরের ভাষাটি প্রকাশ করে' বলে—মেসোমশাই, তুমি আমার অনেক করেছ!

বেলা বেশি হয়ে যাচ্ছিল। খাবারের আয়োজন হল।

সুলতা আহার এবং রায়-সায়েব রস পরিবেশন করলেন।—খেতে বসে' সতীশ বল্‌ল—ঋণী রইলাম দাদা।

একটু হেসে রায়-সায়েব বললেন—সত্যি? তা হ'লে ভায়া আমি একটু বেশি ব্যবসাদার, মনে করে' কোনো এক সময় তাড়াতাড়ি এসে আমার ঋণটা পরিশোধ করে' যেয়ো। ধার আমি ফেলে রাখিনে।

সতীশ এদিক ওদিক চেয়ে হাসতে লাগলো। সুলতাও হাসলো। কিন্তু দেখা গেল, অজ্ঞ শিশুর মতো সহজ স্মিতমুখ নিয়ে নিরুপমা এক-ধারে বসে' রয়েছে। তার নির্বোধ দৃষ্টিতে রসালাপের কোনো ছায়াই পড়েনি!

কুণ্ঠিত-সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে সতীশ তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। এ মেয়েটি যেন তার কাছে দুর্জ্ঞেয় রহস্য হয়ে রইল।

সুলতা বলল—আর কি দেশে আপনারা ফিরবেন না?

দেশে?—রায়-সায়েব বললেন—ফিরবো বৈকি, আর বেশি দেরি নেই, বছর পনেরো বাদে পেন্সন হ'য়ে গেলেই দেশে চলে যাবো।

সুলতা বা সতীশ কেউই এ কথায় হাসলো না। বিস্মিত ও ব্যথিত দৃষ্টিতে রায়-সায়েবের দিকে তাকালো। এঁদের এই দীর্ঘ পনেরো বছর কেমন ক'রে যে কাটবে তা যেন স্পষ্ট চোখের সুমুখে ফুটে উঠ্‌লো! সে পনেরো বছরের প্রত্যেকটি দিন প্রত্যেকটি দিনের মতই নিরানন্দ, বিষণ্ণ ও শ্লথগতি!

সতীশ বলল—হয়ত এই ক'বছরের মধ্যে আরো দু'একজন অতিথি আসবে, কি বলুন দাদা?

নিরুপমার দিকে একবার তাকিয়ে রায়-সায়েব বললেন—

আসতেও পারে; আর হয় ত তোমাদের মতোই তারা এক একবার এসে জিজ্ঞেসা ক'রে যাবে, আর কতদিন বাকি! সময় কি তোমাদের হয়ে এল? আর আমরা বলবো, না, দিন আমাদের এখনও ফুরোয়নি! পেন্সন এখনও নেওয়া হয়নি!

সুলতা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে চোখের জল চেপে রইল। আর সতীশ দেখলো, দরজার পাশে নিরুপমা ঠিক তেমনিই বসে' আছে। এতক্ষণ কি কথাবার্ত্তা যে হ'য়ে গেল, তাতে যেন তার কিছুই যায়-আসে না!

বিদায় আসন্ন হ'য়ে এল। পঞ্চাশ মাইল প্রায় এখান থেকে মোটরে গেলে তবে একটি পাহাড়ি রেল-ষ্টেশন পাওয়া যাবে। সকাল সকাল বেরোনো চাই।

চুপি চুপি সুলতা বলল, তুমি ওঁর সঙ্গে একটি কথাও কইলে না ভাই!

অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কথা কইতে হবে শুনেই নিরুপমা যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়্‌লো। সে বরং সতীশের কাছে গিয়ে চুপ করে' দাঁড়াতে পারে কিন্তু কথা কেমন করে' সে বল্‌বে? সুলতার কাছে দাঁড়িয়ে সে মাথা হেঁট করে' রইল।

সুলতা তার কাঁধের উপর হাত রেখে বলল---ডাক্‌বো?

ভীত দুটি বড় বড় চোখ তুলে সে বলল—ভয় করে!

ভয়! তবে থাক্।—সুলতা একটু অপ্রস্তুত হয়ে আড়ালে গিয়ে যাবার আয়োজন করতে লাগলো।

জিনিষ পত্র বাঁধাই ছিল। পাহাড়ি কুলিটা সেগুলো পিঠের উপর বেঁধে নিয়ে হেঁট হয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে চলতে লাগলো।

রায় সাহেব বললেন—চল ভায়া' 'সানি ব্যাঙ্ক' পর্য্যন্ত যাই তোমাদের সঙ্গে, ওখানেই ভাড়াটে মোটর গাড়ী দাঁড়ায়। চল পৌঁছে দিয়ে আসি।

যাবার সময় সুলতা শুধু বলল—কিছু মনে করো না ভাই, তোমার নিজের কথা জিজ্ঞেসা করে' হয়ত তোমাকে দুঃখ দিয়ে গেলাম!

নিরুপমা বলল—কই না, তা ত' আমার মনে হয় নি!

সকলে মিলে পথে গিয়ে নামলো। নিরুপমা গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালো। বিদায়ের সময় না পড়্‌লো তার নিশ্বাস, না এলো মুখে কোন সম্ভাষণ,—নিঃশব্দ, নির্ব্বিকার দৃষ্টিতে পথের দিকে সে চেয়ে রইল।

খানিক দূর গিয়ে—বোধ হয় অন্যায় হবে এই ভেবে—সতীশ একবার ফিরে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে ছোট একটি নমস্কার জানালো!

কিন্তু সে-ভদ্রতার প্রতিদানে নিরুপমা তার বোবা ও নিরর্থক দৃষ্টি মেলে শুধু দাঁড়িয়েই রইল—এক চুল নড়লো না পর্য্যন্ত!

সতীশের মনে হল, সে কি পাথর!

সন্ধ্যার পর রায় সাহেব ফিরে এসে চেয়ারের উপর বসে' পড়লেন। নিরুপমা তাড়াতাড়ি এসে তাঁর জামার বোতাম খুলে দিতে লাগলো। পরে জামাটা খুলে একটা হুকে যত্ন করে টাঙিয়ে রেখে জুতোর ফিতে ও মোজা খুলে দিল।

রায়-সাহেব বললেন—একলা আমাকেই শুধু তোর ভাল লাগে—না নিরু' মা? সঙ্গে কেউ থাক্‌লে বোধ হয় তোর অসুবিধে হয় কি বলিস?

নিরুপমা একটু হাসলো। পরে উঠে একবার ঘরের মধ্যে গেল এবং পুনরায় বেরিয়ে এসে বলল—এই রুমালখানা ওঁরা যাবার সময় ফেলে গেছেন মেশোমশাই! বোধ হয় ভুলে কোনোরকমে—

রুমাল!—কই দেখি?

রুমালখানি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রায়-সাহেব বললেন—সিল্কের রুমাল দেখছি, এই যে সতীশের নাম লেখাও রয়েছে এই কোণে!—অনেকদূর এতক্ষণ চলে গেছে, ঠিকানাও রেখে যায় নি।

তা হ'লে কি হবে?

তুলে রেখে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি মা? যদি কোনো দিন আবার দেখা হ'য়ে যায়—

রুমালখানি আবার হাতে করে' নিয়ে নিরুপমা ঘরের মধ্যে গেল। রায়-সাহেব তার পথের দিকে চেয়ে রইলেন।

কুড়িটি বছর তারপর পার হয়ে গেছে।

বাঙলার এক নিভৃত পল্লীতে,—চারিদিকে শাল-বন, কাছেই ছোট কাঁসাই নদী, পিছনে দিগন্ত-বিস্তার ধানের ক্ষেত, সেখানে শালিক আর বুলবুলির ঝাঁক চরে' বেড়ায়। মাঠের ধার দিয়ে বনের কিনারা দিয়ে গ্রাম্যপথখানি প্রায় নদীর কোলে গিয়ে মিশেছে। নদীতে খেয়া চলে। শীতের শেষে চর জেগে ওঠে, ওপারে চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা বসলে এপারের যাত্রীরা হেঁটেই পার হয়ে যায়।

সমাজ-বিচ্ছিন্ন দুটি সঙ্গীহীন নরনারীর আবার এইখানে দেখা মেলে। রায়-সাহেব এখন বৃদ্ধ। অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে মাথার চুলগুলি শাদা হয়ে গেছে, ললাটে তাঁর সায়াহ্ন দিনের রেখা, চোখে অবসন্ন বার্দ্ধক্য।

পল্লীর ধূসর সন্ধ্যা আজও তাঁদের কাছে তেমনি বাণীহীন বিষণ্ণ বিধুর। নির্ব্বান্ধব নিঃসঙ্গ ঘরখানির মধ্যে আজও তেমনি অবিচ্ছিন্ন শান্তির কণ্ঠ রোধ হ'য়ে আসে। এবং আজও তাঁর পদতলটী আশ্রয় করে, একান্ত মমতাময়ীর মতো নিরুপমা ম্লান প্রদীপ-শিখার দিকে চেয়ে বসে' থাকে। মাথার চুল তার কয়েকগাছি শাদা হ'য়ে গেছে, কপালে-মুখে প্রৌঢ়ত্বের জীর্ণতা, সুন্দর দুখানি হাতের মাংস ঝুলে পড়েছে, চোখদুটি অকম্পিত, আত্মসমাহিত! শাড়ীর বদলে পরণে শুধু শাদা থান। তপঃক্লিষ্টা, বিশীর্ণদেহা—তাপসী নিরুপমা!

রায়-সাহেব মাঝে মাঝে তার দিকে তাকান। ভাবেন এ তিনি কি করেছেন? নারীর আশ্রয়দাতা হ'তে গিয়ে তিনি যে তিলে তিলে

তার শৃঙ্খলাবদ্ধ যৌবনকে হত্যা করেছেন! এ যে অন্যায়, এ যে পাপ! পরম যত্নে তিনি তাকে লালন-পালন করেছেন, কিন্তু ওই একান্ত নির্ভরশীলা মেয়েটির সারা জীবনের আনন্দটুকুকে নির্ব্বাসিত করে' দেবার অধিকার কে তাঁকে দিয়েছিল?

ধীরে ধীরে উঠে তিনি বাইরে চলে' যান্। বারান্দায় পায়চারি করে' বেড়ান্। অন্ধকার রাত্রির দিকে তাঁর ক্ষয়ক্ষীণ শীর্ণ দৃষ্টি মেলে দিয়ে হয়ত ভাবেন—প্রতিদিন প্রতি পলে ঐ মেয়েটি তাঁর দেওয়া মরণের রস ক্রমাগত অঞ্জলি ভরে' পান করেছে। এ তিনি কি করলেন?

তিমির-রাত্রির পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার নিরানন্দ মূক জীবনের অভিশাপের মত তাঁকে চেপে ধরে!

কে ও? নিরু' মা?

নিরুপমা সরে' এসে একটি হাত তাঁর ধরে' বললো—ঠাণ্ডা লাগবে যে মেসোমশাই? ভেতরে এসো।

ভিতরে নিয়ে গিয়ে কাছে বসিয়ে নিরুপমা হঠাৎ বলল—এ কি? চোখ দিয়ে তোমার জল পড়চে যে মেসোমশাই? দিনরাত আজকাল তুমি যেন—

রুদ্ধকণ্ঠে রায়-সাহেব বললেন—ক্ষমা চাইতে যে লজ্জা করে মা, তাই ত চোখে জল আসে।

নিরুপমা চুপ করে' রইল। আজও যেন সে নিঃশব্দে বলছে—তুমি আমার জন্যে অনেক করেছ মেসোমশাই!

খানিকক্ষণ পরে রায়-সাহেব বললেন—বুকের কাঁপুনিটা আজ আবার একটু বেড়েছে মা, সেই ওষুধটা যদি একবার—

বলতে বলতেই নিরুপমা উঠে দাঁড়ালো। বলল—ও ঘরে বাক্সের মধ্যে আছে, এখুনি এনে দিচ্ছি! খেলেই কমে যাবে।—বলে' সে বেরিয়ে গেল।

সেই যে গেল আর আসে না—আলোটাও হাতে করে' নিয়ে গেছে,—ঘর অন্ধকার!

গলা বাড়িয়ে রায়-সাহেব বল্লেন—খুঁজে না পাস্ ত থাক্ মা আজকের মতো। একটু কমে' গেছে। কাল সকালে বরং—

কোনো সাড়া এলো না। তিনি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। দরজা পার হ'য়ে বারান্দা দিয়ে এ-ঘরে এলেন। দেখেন বাক্স খোলা, কতকগুলো জিনিষপত্র এলোমেলো ভাবে মেঝের উপর ছড়ানো,—আলোর দিকে চেয়ে নিরুপমা নিঃশব্দে বসে' রয়েছে। ঠিক পাথরের মতো!

বল্লেন—রাত অনেক হয়েছে মা, এরপর খাওয়া দাওয়া কল্লে ...থাকগে ওগুলো পড়ে, কাল সকালে গোছালেই হ'বে।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার তিনি বল্লেন—আজ তোমার মুখখানি কিন্তু বড় ক্লান্ত হয়েছিস—না মা? শরীরটাও যেন তোর ক'দিন থেকে...কথা কচ্ছিস্‌নে যে?

নিরুপমা তবুও কথার উত্তর দিল না। রায়-সাহেব বল্লেন ওখানা কি মা তোর হাতে? রুমাল? সিল্কের মনে হচ্ছে যেন ...ভারি চমৎকার ত? দিবি মা আমাকে নতুন বছরের উপহার, —ও কি রাগ করলি বুঝি ছেলের ওপর? নিরু'মা?

নিরুপমা ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকালো। আলোয় দেখা গেল, বড় বড় দু'ফোঁটা জল তার চোখে চক্‌চক করছে।

প্রেতিনী

সব সাধ-আহ্লাদ ঘুচে যায়—তখন তের বছরের মেয়ে। বিয়ের তিন দিন না যেতেই স্বামী হ'ল দেশত্যাগী। কপালের সিঁদূরের চিহ্নটুকু রইল কিন্তু হাট গেল ভেঙে। সে ভাঙা-হাটে আসর আর জমলো না। সধবা, বিধবা ও কুমারীর একত্র সমাবেশে চন্দ্রময়ী হ'য়ে রইল সকলের চোখে একেবারে অপূর্ব্ব!

সংযম এবং সতীত্বের পরীক্ষা চলল বছরের পর বছর। চন্দ্রময়ীর হৃদয়াবেগ ছিল না, ব্যর্থতার বেদনা ছিল না, সুতরাং পথ চল্‌তে গিয়ে পা তার এতটুকু টলেনি। হেসে-খেলে, ভালমন্দ খেয়ে, ঝগড়া-ঝাটি ক'রে, পরের সেবা ক'রে, তীর্থে তীর্থে ঘুরে, রামায়ণ, মহাভারত প'ড়ে দিব্যি বয়সটা গেল কেটে।

যেটুকু চঞ্চলতা ছিল থেমে গেল, আগুন যেটুকু ছিল ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে গেল ছাই হ'য়ে। রক্তের মধ্যে জল মিশে পাত্‌লা হ'য়ে গেল, বুদ্ধি-বৃত্তিটাকে আচ্ছন্ন করল আসন্ন-বার্দ্ধক্যের একটি অস্পষ্ট ছায়া!

চন্দ্রময়ীর বয়স এই সবেমাত্র চল্লিশ পার হ'য়েছে। জীবনে তার একটিও ভালোবাসা হ'য়েছিল কি না কে জানে! হয়েও থাকতে পারে! স্ত্রীর মতো ক'রে একজনও কেউ ভালবাসেনি—বয়স্থা কোনো মেয়ের পক্ষে এ কথা যে অতিরিক্ত সম্মানহানিকর! ভালবাসিনি এ কথা অনেক মেয়েই বলতে পারে, কিন্তু ভালবাসা পাইনি এ কথা বলতে মেয়েদের মুখে কেমন যেন আটকায়।

চন্দ্রময়ীর বাসস্থানটি—বাড়ীটি নিতান্ত ছোট নয়। কিন্তু কে যে কর্ত্তা এবং কে কে যে বাস করে তা আজও পর্য্যন্ত জানা যায়নি। তিনটি তলায় সবশুদ্ধ অনেকগুলি বারান্দা এবং দালান, ধর্ম্মশালা ব'লে ভুল হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়; আতিথ্য নেবার এমন অবাধ সুবিধাও সহজে মেলে না। মাঝের তলায় যে ঘরখানি এতদিন খালিই পড়েছিল, সেদিন দেখা গেল একটি স্বামী ও স্ত্রী এসে সেখানি দখল ক'রে বসেছে।

বউটি ছেলে মানুষ। নিজেই রাঁধে-বাড়ে, নিজেই সব কাজকর্ম্ম করে; এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে দেখা যায় যে ঘরের মধ্যে খিল এঁটে দিয়ে নিঃসাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। যে পুরুষ মানুষের ভিড় চারিদিকে!—লোকজনের যাতায়াত একদণ্ডও কামাই নেই!

তেতলা থেকে চন্দ্রময়ী একদিন নেমে এল, দরজার কড়া নাড়তেই ভিতর থেকে বউটি দরজা খুলে দিল, চন্দ্রময়ী একটুখানি হেসে জিজ্ঞাসা করল—তোমার নাম কি মা?

এমন আকস্মিক কৌতূহলের সঙ্গে বউটির পরিচয় ছিল না। আস্তে আস্তে বলল—নিরুপমা।

নিরুপমা? বেশ নাম। আচ্ছা নিরু ব'লেই ডাকবো।—ও-কি, অবেলায় মাথার চুল এলো কেন? চুল তোমার একেবারে মেঘের মতন বাছা! ব'সো বেঁধে দিয়ে যাই।

নিরুপমা আর প্রতিবাদ করতে পারল না। কাঁটা, চিরুণী, ফিতে বা'র ক'রে আন্‌ল। চন্দ্রময়ী ভিতরে ঢুকে তাকে কোলের কাছে নিয়ে চুল বাঁধতে ব'সে গেল।

কি করেন তোমার স্বামী, হ্যাঁ বৌমা?

দোকান আছে।

ও।—ছেলেপুলে ক'টি?

—এখনো কিছু হয়নি।

চুল বাধতে বাঁধতে চন্দ্রময়ী এদিক ওদিক তাকায়। বদ্ অভ্যাস একটি তার ছিল বৈ কি! ভ্রূ-কুঞ্চিত কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার কেমন একটা পীড়াদায়ক সন্দেহ আর উদ্বেগ দেখা যেত।

ও-ছবিটি কার বৌমা? ওই যে জান্‌লার পাশে?

উনি আমার বড়কাকা।

ও, সেলাইয়ের কাজ রয়েছে দেখছি; সেলাই কর?

হুঁ!

আচ্ছা, বাসিফুল অতগুলো জমিয়ে রেখেছ কেন? তোমার স্বামী বুঝি এনে রেখেছেন?

হুঁ।

তা বেশ বেশ, বলি হ্যাঁ মা, ঘরটা ঝাঁট দাওনি?

বউটি বল্‌ল—দেবো এইবার।

চুলের মধ্যে কাঁটা গুঁজে দিয়ে চন্দ্রময়ী খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। পরে বল্‌ল—তোমরা বুঝি কলাইয়ের বাসন ব্যাভার কর বৌমা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওগুলো কিসের কৌটো? মসলা-পাতি থাকে বুঝি?

প্রশ্নের পর প্রশ্নে নিরুপমা ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে উঠেছিল। চন্দ্রময়ী বুঝতে পারল কি না কে জানে! উঠে যাবার আগে বল্‌ল—দেখি বৌমা, একবার এদিকে ফেরো ত!

নিরুপমা ঘুরে বসতেই তার মুখখানি ধ'রে চিবুকটি নেড়ে আদর ক'রে চন্দ্রময়ী বল্‌ল—বেশ বৌ, খুব পছন্দসই। তারপর উঠে চ'লে যাবার সময় ব'লে গেল—তুমি আমার মেয়ের বয়সী! আচ্ছা মা, আবার আসব'খন।

নিরুপমা অবাক হ'য়ে তার পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

তাড়াতাড়ি সে তেতলায় নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে খুব হাসতে লাগল। এ হাসির মধ্যে নারীর অন্তর-মাধুর্য্যের চেয়ে তীব্র তীক্ষ্ণতাই ছিল পরিমাণে কিছু বেশী। এ হাসি দেখলে জয়ের উল্লাসকেই শুধু মনে পড়ে।

চন্দ্রময়ীর জীবন-যাত্রার যে কোনো-শৃঙ্খলা নেই তা বেশ বোঝা যায় তার অগোছালো ঘরখানির চারিদিকে তাকালে। কাপড়ের কুটি, ভাঙা টীন, ছেঁড়া বিছানা, পুরানো হাঁড়ি, ফুটো থালা-বাসন প্রভৃতিতে ঘরখানি একেবারে বোঝাই। আমকাঠের একটা খোলা মাঝারি সিন্দুকের মধ্যে আরসোলা গিজ্ গিজ করছে, পায়া ভাঙা জল-চৌকী চিৎ ক'রে তার উপর রাজ্যের জঞ্জাল জড়ো করা, কাঁচকড়ার একটা তোব্ড়ানো পুতুল মাথা-কাটা অবস্থায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। চন্দ্রময়ীর এসব কোনোদিন খেয়ালেই আসে না। সে যে রান্নাবান্না ক'রে, খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে বেঁচে থাকে কেমন ক'রে, এটি ভাববার কথা!

সারাদিন চন্দ্রময়ীর কাজ ফুরোত' না, অবসর ছিল না তার এতটুকু। কিন্তু কী যে সে কাজ, সমস্তক্ষণ ঘুরে ঘুরে কেন যে সে শশব্যস্ত থাকত,—বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ না করলে তার হদিস পাওয়া যেত না। সকলের সঙ্গে একটু-আধটু জড়িয়ে থাকলেও তার কোনো স্পষ্ট ব্যক্তিত্ব নেই; সকলের মাঝখানে থেকেও সকল মানুষের থেকে দূরে ছিল তার স্থান। রাসভারীও ছিল না তার, হাঁটলে বা ছুটলে তার পায়ের শব্দও হ'ত না! চোরের মতো গোপন আনাগোনায় সে ছিল অতিরিক্ত অভ্যস্ত।

নিচের তলার ঘরগুলি বিশেষ বাসযোগ্য ছিল না, দু'-তিনখানি নোংরা অন্ধকার ঘর এই সেদিন পর্য্যন্ত খালিই প'ড়ে ছিল। অনেকদিন অনেক সময় এই ঘরগুলি থেকে চন্দ্রময়ীকে চট্ ক'রে বেরিয়ে চ'লে

যেতে দেখা গেছে। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলত—এমনি, যদি কেউ আসে···ঘর-দোর পরিষ্কার থাকলে ভাল দেখায়।

অনুমান তার মিথ্যে নয়, লোকজন এল। গুটি তিন-চার যুবক ছুটিতে পশ্চিমে হাওয়া খেতে এসেছে। থাকবে কিছুদিন।

চন্দ্রময়ী কার একটা ফুটো-সারানো বালতি নিয়ে উপর থেকে নেমে এল। দরজায় কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—কুলোবে ত বাবা, দু'খানি ঘরে তোমাদের চলবে? কাশীর বাড়ী সব এমনিই বাবা, সব জায়গাতেই অন্ধকার!

একটি ছেলে বল্‌ল—চ'লে যাবে কোনরকমে। এটা ত আপনার বাড়ী, নয়?

আর বাবা, আমার জিনিষ কি আর বলা চলে? এসব তোমাদেরই, আমি শুধু আগ্‌লে দরোয়ানের মতন ব'সে আছি। তোমার নাম কি?

ভূপতি। আর এই আমার বন্ধু দয়ানন্দ, আর উনি নিখিল।

চন্দ্রময়ী গিয়ে কল্ থেকে এক বালতি জল এনে রাখ্‌ল, পরে জলের উপর ঢাকা দিয়ে ঝাঁটা এনে ঘর ঝাঁট্ দিতে সুরু ক'রে দিল। ছেলেরা নির্ব্বাক দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকালো, পরে বল্‌ল—কি করছেন? এ কি ভালো হ'চ্ছে? এত করলে আমাদের এখানে থাকতে লজ্জা হবে যে।

চন্দ্রময়ী একটুখানি হাসল শুধু। এবং সে হাসি এমনিই যে একাজে যেন আর কারো অধিকার নেই, এ শুধু তারই একার!

এমনি ক'রেই হ'ল আত্মীয়তা, এমনি মুগ-থাবা দিয়েই নিল চন্দ্রময়ী পরের উপর অধিকার! অনাত্মীয়ের সেবার এই যে অনাহূত আতিশয্য—এর টান্ ছিল চন্দ্রময়ীর ভয়ানক বেশী।

দোতলায় যিনি থাকেন তিনি একজন প্রবীণ ডাক্তার। বয়স

আন্দাজ বছর-পঞ্চাশ। কাঁচা-পাকা চুল। বিপত্নীক। একটি তরুণী প্রমুখ কয়েকটি ছেলেপুলে নিয়ে তিনি বেশ শান্তিতেই বসবাস করেন।

মেয়েটির বিবাহের কথা চলছিল। তা' বয়স হ'য়েছে বৈ কি! চন্দ্রময়ী একদিন তাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল,—কলঘরের মধ্যে। একহাতে গলাটা জড়িয়ে আর একহাতে চিবুকটি ধ'রে বল্‌ল —বিয়ে হবে, হ্যাঁ রে বিনীতা?

বিনীতা লেখাপড়া-জানা মেয়ে, সুতরাং তার চেহারায় একটি গাম্ভীর্য্যের ছায়া আছে। বল্‌ল—এমন আড়ালে ডেকে চুপি-চুপি জিজ্ঞেস কচ্ছেন কেন? হ'লে ত' আর লুকিয়ে হবে না।

না, তাই বলছি—চুপি চুপি চন্দ্রময়ী বলল—সত্যি হবে?

মেয়েরা আর কবে চিরকাল আইবুড়ো থাকে, মাসিমা?—বিনীতা গড়গড় কর্‌তে কর্‌তে উপরে উঠে এল।

কোনো মানুষের অবজ্ঞা চন্দ্রময়ীকে আহত করে না।

ভূপতি এবং তার বন্ধুরা বাড়ী ছিল না, চন্দ্রময়ী একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরের কাছে এসে উঁকি মেরে দেখল। কি তার উদ্দেশ্য তা শুধু সে-ই জানে। ফিরে এসে উপরের সিঁড়িতে পা দিতেই তার নজর পড়ল কতকগুলি এঁটো বাসনের উপর। বাসনগুলি ভূপতিদের। চন্দ্রময়ী নেমে এসে সেগুলো কলতলায় নিয়ে গিয়ে মাজতে ব'সে গেল। বামুনের মেয়ে - কিন্তু জাতিভেদের সংস্কার তার তখন মনেই এল না।

কাজ হ'য়ে গেলে ধোয়া বাসনগুলি এনে দরজার কাছে গুছিয়ে রেখে তৃপ্ত মনে সে উপরে উঠে এল। হঠাৎ সুমুখে ডাক্তার বাবুকে দেখেই লজ্জায় ও সরমে মাথার কাপড় আর একটু টেনে দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে সে আবার তেতলায় উঠে গেল। ডাক্তার বাবুকে দেখলে তার বুকের রক্ত বুকের মধ্যেই দাপাদাপি করে!

নিজের ঘরে এসে সে হাঁপাতে লাগল। উত্তেজনায় মুখখানা

তার রোমাঞ্চ হ'য়ে এসেছিল। ডাক্তার বাবু কি তার মুখের চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন ?

রূপ ? চন্দ্রময়ীকে দেখলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে। বিরলকেশ, দাঁত উঁচু, সাপের চোখের মতো দুটো ছোট ছোট চোখ, হাত-পাগুলি কদাকার, চির-উদাসীর মতো একখানি শীর্ণ দেহ,—চন্দ্রময়ী যেন বিধাতার সৃষ্টির ব্যর্থতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

অপরাহ্ণের আলো ম্লান হ'য়ে এসেছে। চন্দ্রময়ী আবার আস্তে আস্তে নেমে এল। দোতলার সিঁড়ির কাছে দরজাটায় একটু ধাক্কা দিল, দরজা গেল খুলে। নিরুপমা নীচে তখন কাপড় কাচ্‌তে গেছে।

ঘরে ঢুকে চন্দ্রময়ী দেখল দু' তিনখানি ধুতি ও সাড়ী মেঝেয় লুটোপুটি খাচ্ছে, সেগুলি সে গুছিয়ে রাখল। বিছানাগুলো এক-জায়গায় জড়ো করা ছিল, সেগুলি অতি যত্নে বিন্যাস করে' মেঝের উপর ছড়াতে লাগল। আগে মাদুর, তারপর সতরঞ্চি, সতরঞ্চির উপর তোষক, তার উপর একখানি ধব্‌ধবে চাদর। চাদরখানি পেতে পাশ-বালিশ সাজিয়ে রাখল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে ফিরতেই একেবারে নিরুপমার সঙ্গে মুখোমুখি। নিরুপমার মুখখানি তখন বিছানার দিকে তাকিয়ে রাঙা হ'য়ে উঠেছে।

এই যে বউ মা, এই নাও বাছা তোমার ঘর-দোর···তুমি একা আর কত পারবে মা ?

নিরুপমা বল্‌ল—রোজই ত করি !

চন্দ্রময়ী একটু হাসল। বল্‌ল—ইচ্ছে হ'ল, ক'রে দিয়ে গেলাম। আমার ত আর হাতে কোনো কাজ নেই মা ! দাঁড়াও বাছা, রাতের জন্য জল তুলে এনে দিচ্ছি।

না, না, থাক—কেন এত কষ্ট করবেন আপনি ?

দরজার বাইরে এসে চন্দ্রময়ী কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল, তারপর নীচে নেমে এসে যাবার সময় তার সেই কদাকার মুখে একটুখানি হেসে বল্‌ল--তা হোক বৌমা, দয়া ক'রে একটু আধটু কিছু আমাকে করতে দিয়ো। এতে ত তোমারই লাভ মা ?

চন্দ্রময়ী সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। নীচের ঘরে তখন আলো জ্বল্‌ছে। ভূপতিরা ঘরের মধ্যে ব'সে ব'সে গল্প করছিল। রান্না-ঘরের ভিতর একটি হিন্দুস্থানী ছেলে রাতের খাবার তৈরী করছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে চুপি চুপি বলল—এই ?

ছেলেটা মুখ তুলে তাকালো। চন্দ্রময়ী বলল—চেঁচামেচি করিস্‌নে। তোর মশলা পিশে দেবার দরকার আছে ত ?

ঘাড় নেড়ে ছেলেটা জানালো, আছে। বাস্ তখন আর কি, চন্দ্রময়ী ভিতরে ঢুকে কোমরে কাপড় জড়িয়ে ব'সে গেল বাটনা বাটতে। অতি যত্নে, অতি সাবধানে এবং অতি গোপনে সে একে একে লঙ্কা, হলুদ, ধনে, জিরা-মরিচ চমৎকার মিহি ক'রে বেটে দিতে লাগল। মনে হচ্ছিল, তার হৃদয়ের সমস্ত দাক্ষিণ্য, মমতা, মায়া—যত কিছু হৃদয়-বৃত্তি তার গুপ্ত হ'য়ে লুপ্ত হ'য়ে ছিল, সেগুলি একে-একে জেগে উঠে এই সব ছোট-ছোট কাজের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে।

—কে তোকে ডেকে আন্‌ল রে ?

ছেলেটা বল্‌ল—ভূপতি বাবু।

চন্দ্রময়ী বল্‌ল—মাইনেটা একটু কম ক'রে নিস্ বাছা। ভূপতির এখন অনেক খরচ !

ছেলেটা চুপ ক'রে রইল। চন্দ্রময়ী পুনরায় বল্‌ল—শরীরটা আমার ভাল নেই কি না, তাই তোকে রাখতে হ'ল। বাবুকে একটু যত্ন-আত্তি করিস, মাইনে বাড়িয়ে দেবো।

বাইরের ঘরে তখন কি একটা কথায় হাসির ধূম প'ড়ে গেছে।

ছেলেগুলি ঠিক শিশুর মতো উচ্ছল, চঞ্চল,—প্রাণের প্রাচুর্য্যে তারা যেন টলমল করছে। চন্দ্রময়ীর কান-দুটো সেইদিকে খাড়া হ'য়ে ছিল। বল্‌ল—যে বয়সের যা, বাইরের লোক কি আর এ সব বুঝবে? একটু হাসি-তামাসা না করলে শরীর ভাল থাকবে কেন?

ছেলেটা এবার বল্‌ল—বাবু ত এখানে শফরে এসেছেন!

তুই থাম্! তুই ত সবই জানিস্। কলকাতাতেই বাবুর সব কাজ, এখানে তাই জন্যে সব সময় থাকা চলে না। বলি ও কি হচ্ছে? অম্‌নি ক'রে কি মাছ নাড়্‌তে লায়? মাছগুলো ত পুড়িয়েই ফেল্‌লি! দে, স'রে বস্।

হলুদ-মাখা হাত দু'খানা ধুয়ে এসে চন্দ্রময়ী ছেলেটাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে রাঁধতে ব'সে গেল। বল্‌ল—দু'একদিন দেখিয়ে শুনিয়ে না দিলে পারবিনে দেখতে পাচ্ছি। দাঁড়া দাঁড়া, যাসনে এখন কোথাও, শোন্ বলি।

ছেলেটা ফিরে দাঁড়াল। চন্দ্রময়ী উঠে গিয়ে বাজার-থেকে আনা মিষ্টি তার হাতে দিয়ে বল্‌ল—গালে দিয়ে এইখানে ব'সে জল খা, যাস্‌নে কোথাও—বুঝলি?

ছেলেটা তাকে বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী বিবেচনা ক'রে নির্ব্বিচারে তার এই আদেশ মেনে নিয়ে নিঃশব্দে ব'সে রইল!

ও ঘর থেকে আওয়াজ এল—এই গির্‌ধারী, বেটা ভাত চড়িয়ে দে না,—পেট যে চুঁই-চুঁই কর্‌ছে!

গির্‌ধারী উঠে দাঁড়াল। চন্দ্রময়ী চঞ্চল হ'য়ে উঠে বল্‌ল—এইখান থেকে উত্তর দে, বল্—'ভাত চড়ানো হ'য়েছে বাবুজি!'

খুন্তিটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে সে একবার বাইরে এসে উঁকি মার্‌ল, তারপর বল্‌ল—দেখিস, আমি এখানে আছি একথা ভূপতি শোনে না যেন। আমার অসুখ হ'য়েছে কি না তাই নীচে নামতে বারণ ক'রে দিয়েছে।

কিন্তু তার এই চৌর্য্যবৃত্তি গির্ধারীর ভাল লাগছিল না। সে ভারি অস্বস্তি বোধ করছিল।

আত্মগোপন করবার শক্তি যার অনেকখানি, মানুষের মনের কথা জানবার একটি বিধিদত্ত ক্ষমতা তার আছে। চন্দ্রময়ী একবার বাইরের দিকে তাকাল, রাত্রি অন্ধকার কি না কে জানে, হয় ত চন্দ্রোদয় হ'য়ে থাকতে পারে, কিন্তু নীচেটা ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। আলো নেই, হাওয়া নেই, আকাশ নেই, অবকাশ নেই,—নিরুদ্ধ নিশ্বাসের মধ্যে মানুষের গলার আওয়াজ ছেঁড়া তব্‌লার শব্দের মতো চ্যাব্‌ চ্যাব্‌ করে। চন্দ্রময়ী ঘাড় ফিরিয়ে গির্ধারীর মুখের দিকে তাকালো। তারপর ধীরে ধীরে বল্‌ল—ভূপতি আমার ছেলে কিনা তুই তা জান্‌বি কি ক'রে, সবে এসেছিস বৈ ত নয়! বত্রিশনাড়ি ছেঁড়া যে ছেলে, সে তার মায়ের শরীর দেখবে না?

গির্ধারী এ কথা আগেই বুঝেছিল।

ভাত নামিয়ে খাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে চন্দ্রময়ী লুকিয়ে চ'লে গেল। ছেলেরা যখন খেতে এসে বস্‌ল, সে তখন আড়ালে দাঁড়িয়ে চোরের মতো তাদের দিকে তাকাতে লাগল, গির্ধারীর পরিবেশনের মধ্যে কতটুকু যত্ন আছে তাও তার নজর এড়ালো না। নিজের হাতে সে যদি ভূপতিদের খাইয়ে দিতে পারত তা হ'লেই হ'ত ভাল!

চন্দ্রময়ী নেমে এসে পা টিপে তাদের ঘরে গেল। বিছানাগুলি ঝেড়ে-ঝুড়ে অতি যত্ন ক'রে পেতে দিল। ঘরের মধ্যে সিগারেট ও দেশলাইয়ের কতকগুলি কুচি ছড়ানো, সেগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে জানালার বাইরে ফেলে দিল। পাছে ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিলে শব্দ হয়, এজন্যে আঁচল দিয়ে সমস্ত ঘরের মেঝেটা সে পরিষ্কার করল।

পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে সে যখন নিঃশব্দে উপরের সিঁড়িতে উঠে গেল, ছেলেরা তখন সোৎসাহে আহার সাঙ্গ ক'রে

উঠেছে। উল্লাসে চন্দ্রময়ীর সর্বাঙ্গ একবারে কেঁপে উঠল। সন্তানের ভোজন-তৃপ্ত মন মাকে কি আনন্দিত করে না?

ঘরের মধ্যে স্বামীকে খেতে বসিয়ে নিরুপমা এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। চন্দ্রময়ীকে এমনি ভঙ্গীতে আস্‌তে দেখে বল্‌ল—অন্ধকারে এতবার যাতায়াত ক'রছেন, একটা আলো হাতে রাখুন না!

আর মা, আলো!—চন্দ্রময়ী বল্‌ল—সময় কই? ছেলে হ'লে মায়ের যে কত জ্বালা, তা ত' আর তুমি এখনও জান্‌লে না!—ব'লে সে তেতালায় চ'লে গেল।

কথাটা ঘরের মধ্যে খেতে খেতে স্বামীর কানে গিয়েছিল। তিনি ভ্রূ কুঁচকে নাক সিঁটিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বল্‌লেন—মাগীটা কেন কথা কয় যখন-তখন তোমার সঙ্গে? বদ্‌মাইস্—'আগ্‌লি'!

নিরুপমা স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে আবার দৃষ্টি নত ক'রে ঘাড় ফিরিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। জীবনকে মানুষ কি ঠিক এমনি ক'রেই বিচার করবে?

উপরে উঠে চন্দ্রময়ী ঘরে ঢুকে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়ল। ভূপতির রান্না করতে পেয়ে আজ সে যেন ধন্য হ'য়ে গেছে। আজ এই রাত্রিটিতে দুঃখের একবিন্দু চিহ্নও যেন তার মধ্যে নেই! চোখে আজ তার হয় ত ঘুম আসবে না, মনের নিত্য-নিয়মিত ক্লান্তি আসবে না—সমস্ত রাত আনন্দের উত্তেজনায় আজ হয় ত তাকে ছাদের ওপর ঘুরে ঘুরেই বেড়াতে হবে!

জান্‌লা-দরজাগুলো খোলাই রইল, বিছানা হ'ল না, না হ'ল ঘর পরিষ্কার,—আলোই বা সে কি জন্যে জ্বালবে!

কিন্তু তার সমস্ত মন বিশৃঙ্খল, জীর্ণ ও মলিন গৃহসজ্জাগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অপরিসীম আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভ'রে উঠতে লাগল। আজ তার সমস্ত দৈন্য সার্থক ক'রে দীপশিখা জ্বলে উঠেছে!

সারাদিন পরিশ্রমের পর তার চোখ বুজে এল। কিন্তু চোখ বুজে সে দেখলে শিশু-ভূপতিকে। ফুটফুটে দু' বছরের ছেলে, অশান্ত, পাথরের কুচির মতো কঠিন, স্তন্য পিপাসায় শিশু-ব্যাঘ্রের মতো সে যেন চন্দ্রময়ীর বক্ষস্থল প্রথম দাঁতের আঘাতে জর্জ্জরিত করছে!

ভাবতে ভাবতে চন্দ্রময়ীর গা ঢোল হ'য়ে এল।

মাদুরের উপর ব'সে নিরুপমা কি একখানা মাসিকের পাতা ওল্‌টাচ্ছিল; চন্দ্রময়ী ঘরে এসে ঢুক্‌লো।

—এসে যে দুদণ্ড বসবো বৌমা, তার সময়ই পাইনে। তোমার সেই যে সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ ছিল, শেষ হ'য়ে গেছে বুঝি?

হ্যাঁ, সে সামান্যই!

সেলাইটাও যদি শিখতাম!—চন্দ্রময়ী বল্‌ল—কোনো কাজই হাতে থাকে না কি না, তাই কোনো কাজের সময়ও করতে পারিনে। চির কালটা ভূতে পেয়েই রইলাম মা।

কণ্ঠস্বরের মধ্যে তোষামোদের যে ঈষৎ আভাসটুকু ছিল, তা নিরুপমার লক্ষ্য এড়ালো না। কিন্তু সে ব্যথিত দৃষ্টিতেই চন্দ্রময়ীর দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—ভগবানের রাজ্যে এমন যে কেন হয় বোঝাই যায় না।

চন্দ্রময়ী বল্‌ল—সেই প্রথম দিনটি থেকে তোমাকে আমার ভাল লেগেছে বৌমা! মনে মনে তোমাকে নিয়ে অনেক কথা ভেবেছি।

একটুখানি ম্লান হাসি হেসে বল্‌ল—কি রকম?

চন্দ্রময়ী বল্‌ল—না তা নয়, এই পর পেটের মেয়ের মতন তোমাকে আমি ভাবতে পারিনে বৌমা! যদি তোমাকে আমি এ জন্মেই ছেলের বউ ক'রে পেতাম!

ও কথা ব'লে আর লাভ কি বলুন? ইচ্ছে মানুষের অনেক রকমই থাকে। ভেবে ভেবে শুধু দুঃখই বাড়ানো!

তাই বলছি।—মেঝের উপর আঙুল দিয়ে দাগ টানতে টানতে চন্দ্রময়ী বল্‌ল—ভাগ্যবতী নৈলে ভূপতির মতন ছেলে পেটে ধরা যায় না। যেমন রূপ, তেমনি গুণ! তিনটে পাশ করেছে, কলকাতায় কারবার—দেশে জমিদার। বালকের মতন সরল, বিনয়ী—বাছা আমার দুঃখের ধন বৌমা!

পরের ছেলের প্রতি এমন একান্ত মমতা, এবং তাই নিয়ে এমন মনোহর স্বপ্নজাল রচনা করা,—নিরুপমা একটুখানি অবাক হ'য়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল!

চন্দ্রময়ী বলল—অনেক জিনিস ঘটে না বৌমা, যা ঘটলে ভালো হ'তো। স্বামী নিয়ে তুমি ঘর করছো অথচ ভূপতি আজও বিয়ে করল না, একথা কি কেউ ভেবেছিল? সংসারে অনেক জিনিসেরই আমরা হদিস্ পাইনে না।

অর্থাৎ—?

নিরুপমা ঘাড় ফিরিয়ে তার প্রতি তাকালো। কোথাকার কে ভূপতি বিয়ে করেনি সে আলোচনা তার কাছে কেন? ভূপতির বিয়ে না করার সঙ্গে তার স্বামী নিয়ে ঘর করার সম্পর্ক কি?

চন্দ্রময়ী বল্‌ল - তা ধর মা, ভূপতি আমাদের' কিছু অপছন্দর নয়। ভূপতির হাঁড়িতে চাল দিলে কোনো মেয়েই কি অসুখী হবে তুমি মনে কর মা?

আপনার কাছে কি কোনো পাত্রী আছে? নিরুপমা বল্‌ল।

সে কথা বলছিনে বৌমা—একটু হেসে চন্দ্রময়ী বল্‌ল—পাত্রী কোথা পাবো? আমার হাত দিয়ে ত কেউ মেয়ে পার করতে চাইবে না। বল্‌ছি মা তোমার কথা···তোমাকে দেখে অবধিই আমি এই কথা ভাবছি।

নিরুপমা বড় বড় চোখে তাকালো।

হ্যাঁ, তোমার কথাই বলছি বৌমা…তোমার যে স্বামী আছে বৌমা, একথা আমি ভাবতেই পারিনে! তুমি ত কুমারী মেয়ে! আচ্ছা, চুপি চুপি বলত বৌমা সত্যি ক'রে…আমাকে মা পাগল মনে করো না…বল ত' ভূপতিকে তোমার পছন্দ হয় না? সত্যি বল্‌ছি মা, ভূপতি তোমার স্বামী হ'লে বুঝতে যে—"

আহত ক্রুদ্ধ সর্পের মতো নিরুপমা উঠে দাঁড়াল। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌ল—চ'লে যান্—যান্ শীগ্‌গির বল্‌ছি…এক মিনিটও আর এ ঘরে বসবেন না!

তার মুখের চেহারা দেখে চন্দ্রময়ী আর বসতে পারল না, উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে ঢোক গিলে বল্‌ল—অন্যায় হ'য়েছে বৌমা?

বৌমা তার উত্তরে বল্‌ল—কই এখনও বেরোলেন না ঘর থেকে? উনি যা বলেন মিথ্যে নয়, উনি মানুষ চেনেন। খবরদার আমাকে আর বৌমা বলে' ডাকবেন না! আপনার কি ধর্ম্মভয় নেই? যান্ এ-ঘর থেকে। আপনার বাড়ীতে ভাড়া ক'রে আছি ব'লে অপমান করেন কোন্ সাহসে?

মাথা হেঁট করে চন্দ্রময়ী বেরিয়ে চ'লে গেল।

গেল বটে কিন্তু একটুকু আঁচ তার গায়ে লাগল না। উপরের ঘরে গিয়ে সে যখন আবার প্রতিদিনের কাজকর্ম্মে মন দিল, মনে হ'লো, অপমানিত হওয়ার অভিজ্ঞতা তার নতুন নয়। আঘাত পেয়ে আহত হ'ল না, সামাজিক নীতিকে পদদলিত করতে সে কুণ্ঠিত হ'ল না—স্বচ্ছন্দে নির্ব্বিকার চিত্তে সে ঘরের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে লাগল!

নিরুপমার ঘরের পাশ দিয়ে আনাগোনা করে কিন্তু কথা বলতে

আর সাহস করে না। এ ঘরটি চিরকালের জন্য তার মুখের উপর বন্ধ হ'য়ে গেছে।

দোতলায় নেমে ডাক্তার বাবুর ছেলে-মেয়েগুলির সঙ্গে সে হেসে হেসে কথাবার্ত্তা কয়। একটু আধটু খেলাও করে। ছেলেমেয়েগুলি তার বড় প্রিয়। বিনীতা প্রায়ই লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে,—এই কদাকার স্ত্রীলোকটার গতিবিধির প্রতি নজর দেবার প্রয়োজন সে মনেই করে না।

চন্দ্রময়ী যে লুকোচুরিও খেলতে পারে একথা ছোট ছেলেমেয়েগুলির জানা ছিল না। সুতরাং এই পরম স্নেহময়ী স্ত্রীলোকটির সঙ্গে মিলে-মিশে তারা চমৎকার আমোদ পায়। হুড়বুদ্ধ ক'রে সারাদিন বেড়াতে পারলে তারা আর কিছু চায় না।

এক একবার একটু থেমে কোনো একটা ছেলে কিম্বা মেয়েকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে চন্দ্রময়ী অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করে।

—তোর বাবা খুব হো হো ক'রে হাসেন, না রে মণ্টু?

মণ্টু বলে—হুঁ, খুব! খুব হাসে মাসিমা, হা হা ক'রে।

বাবা তোর কি খেতে ভালবাসেন রে?

মেজ মেয়েটা ব'লে উঠ্‌ল—পুঁই শাক মাসিমা, ইলিশ মাছ দিয়ে। ইলিশ আর পুঁই-চচ্চড়ি!

ও,—চন্দ্রময়ী খানিকক্ষণ উদাসীন হ'য়ে রইল। পরে বল্‌ল—রাত্তিরে কি খান?

রাত্তিরে? লুচি।

ডাক্তার বাবু তোদের খুব ভালবাসেন, না রে?

হুঁ—আমাকে সব চেয়ে বেশী!

বাস্, অমনি গোলমাল সুরু হ'ল। সবাই চীৎকার ক'রে বলে উঠ্‌ল—আমাকে বাবা সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসে, মাসিমা, আমাকে!

চন্দ্রময়ী বলিল—আচ্ছা লটারী ক'রে দেখি দাঁড়া।

লটারি হ'ল,—উঠ্‌ল কিন্তু ফোক্কা! চন্দ্রময়ী বলল—থাক্ লটারি—যাক্ গে। আচ্ছা, রাত্তিরে ডাক্তার বাবুর কাছে কে শোয়?

মণ্টু তখন বীরের মতো এগিয়ে এল। বলল—আমি!

চন্দ্রময়ী তাকে ভুলিয়ে কোলে তুলে' নিয়ে উপরে চ'লে গেল। উপরে গিয়ে তার হাতে সন্দেশ দিল, ঠাকুরের প্রসাদী কিস্‌মিস্ দিল। কোলের মধ্যে বসিয়ে তাকে আদর করল, আষ্টেপৃষ্ঠে চুম্বন করল। তারপর তাকে তুলে এনে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—লাট্টু কিনবি মণ্টু! কত দাম বল্ দিচ্ছি।

মণ্টু বল্‌ল—চার পয়সা।

আচ্ছা দেবো, আগে আমি যা বলব শুনবি?

হুঁ, শুনবো।

উত্তেজনায় এবং দুরন্ত উল্লাসে চন্দ্রময়ী থর-থর ক'রে কাঁপছিল—রক্তের তরঙ্গ প্রচণ্ড আকারে উদ্দাম হ'য়ে তার বুকের মধ্যে মাতামাতি করছিল। বলল—ডাক্তার বাবু তোর কে হয়?

বাবা।

আমি তোর কে হই?

মাসিমা।

চুপ!—ব'লে সে মণ্টুর মুখটা হাত দিয়ে টিপে ধরল। বল্‌ল—খুন করবো এখুনি। বল—'তুমি আমার মা হও!' বল লক্ষীটি, এখুনি লাট্টু কিনতে দেবো—বল?

মণ্টু সাত বছরের ছেলে। মা মরেছে ত এই বছর দুই হ'ল,—বেশ মনে আছে। তবু ভয়ে ভয়ে বলল—মা!

আঁচল খুলে চারটি পয়সা তার হাতে দিয়ে চন্দ্রময়ী বলল—যা,

পালা এইবার! এবার থেকে হাতের মধ্যে পয়সা টিপে দিলেই কিন্তু চুপি চুপি ওই ব'লে ডেকে যাবি—কেমন?

মণ্টু ঘাড় নেড়ে নীচে নেমে গেল।

কিন্তু এই ক্লেদোক্ত জঘন্য কৌশল, বিকৃত চিন্তাধারার এই কুৎসিত প্রকাশ, এর মধ্যে তার যে ক্ষুধাই প্রকাশ পাক্—আপনার আনন্দে আপনি বিহ্বল হ'য়ে এই মনোবিলাসিনী নারীটি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূ, সন্তান-সন্ততি থাকার আনন্দ যে কেমন—ঠিক এই রকমটি কি না—চন্দ্রময়ী হাসতে হাসতে কেবল এই কথাটাই বারে বারে ভাবতে লাগল!

গভীর রাত পর্য্যন্ত ডাক্তারবাবু লেখাপড়া করছিলেন। বারান্দার সুমুখেই খোলা জানালার ধারে একটি টেবিল—চারিদিকে কাগজ-পত্র ছড়ানো—মাঝখানে একটি উগ্র উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। গভীর মনোনিবেশ সহকারে ডাক্তার বাবু চোখে চশমা লাগিয়ে বইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আলো পার হ'য়ে বাইরে তাঁর নজর আসার উপায় নেই, বাইরের সমস্তই অন্ধকার দেখায়।

রাত বোধ করি অনেক। ছেলেমেয়েরা সবাই তখন অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিচে ভূপতিদের আর কোন সাড়া-শব্দ নেই,—নিরুপমার দরজার ভিতর থেকে বন্ধ। নিস্তব্ধ রাত্রে দূরে কোথায় একটা মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ তখনও ভেসে ভেসে আসছিল।

—কে দাঁড়িয়ে ওখানে!

পাশের ঘর থেকে বেড়িয়ে বিনীতা এসে দাঁড়াল। চন্দ্রময়ী থতমত খেয়ে বলল—বিনীতা? ঘুমোওনি এখনো?

কটুকণ্ঠে বিনীতা বলল—না, বেশ শাদা চোখেই আমি জেগে ছিলাম। আলোর সামনে ছায়া পড়ছে দেখে·····জানালার ভেতরে

চেয়ে কি দেখছিলেন শুনি ? রোজ রাত অবধি বাবাকে কাজ করতে হয়, এখানে এসে দাঁড়িয়ে আপনার কি লাভ ?

ভিতর থেকে ডাক্তার বাবু সাড়া দিয়ে বললেন—কি হ'ল রে বিনু ?

কিছু না বাবা, আপনি কাজ করুন—বিনীতা বল্‌ল।

মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে একটুখানি স'রে এসে অপরাধীর মতো চন্দ্রময়ী বল্‌ল—আলো নিভে গেছে মা, তাই একটা দেশলাইয়ের জন্যে—

দেশলাই আমার কাছে চাইলেই ত হ'ত ? হাতড়ে হাতড়ে একটি দেশলাই ব'ার করে ঠক্ ক'রে ফেলে দিয়ে বিনীতা বলল—যান্, যদি কিছু দরকার হয় ত দিনের বেলায় সকলের সুমুখে আমাদের কাছে চাইবেন, দেবো। নইলে অমন চোরের মতন রাতের বেলা—ছিঃ!

হাতে করে দেশলাইটা নিয়ে চন্দ্রময়ী আবার উপরে উঠে গেল। ঘরে আলো জল্‌ছে। এঁটো-কাঁটা, আহারের সামগ্রী চারিদিকে ছড়ানো। আঁচলের ভিতর থেকে একবাটি তরকারী সে মেঝের উপর নামিয়ে রাখ্‌ল,—ইলিশ মাছ এবং পুঁইশাকের তরকারী!

ব'সে প'ড়ে সে খানিক চুপ ক'রে রইল। মনে হ'ল, বহু কষ্টে ও যত্নে নিতান্তই আগ্রহে সারাদিন ধ'রে সে আজ রান্না-বান্না করেছে। এই বাড়ীর সমস্ত লোককে সযত্নে খাওয়াতে পারলে নিতান্ত মন্দ হ'ত না!

অনেকক্ষণ অনেক রকম ক'রে সে ভাবল। মনে হ'ল, তার সে চিন্তার কূল নেই, অতীত নেই, বর্ত্তমান নেই!—আজকের এই সামান্য ব্যর্থতায় মনে হ'ল তার জীবনের পরিপূর্ণ স্পষ্ট ছবিটি ফুটে উঠেছে! এ চিন্তায় রাতই হয় ত শেষ হ'য়ে যাবে।

আলোটা সরিয়ে এনে সারাদিনের পর ভাত বেড়ে সে যখন ইলিশ মাছ ও পুঁইশাকের তরকারী দিয়ে গ্রাসের পর গ্রাস তুলতে

লাগল, তখন তার ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ দু'টো দিয়ে ঝর ঝর্ ক'রে জল নেমে এসেছে।

বিনীতা কিন্তু এ চৌর্য্যবৃত্তিকে ক্ষমা করতে পারল না।—

পরদিন চন্দ্রময়ী সম্বন্ধে একটি অস্ফুট গুঞ্জন অগ্নির মতো ক্রমে বৃহদাকার-ধারণ করল। বেলা তখন অবেলা।

নিরুপমার স্বামী খগেন হঠাৎ এমন একটি মন্তব্য ক'রে বসল, ডাক্তার বাবু যার প্রতিবাদ না ক'রে পারলেন না। বিনীতা আগুন হ'য়ে উঠেছিল, নিচে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় ভদ্রভাষায় রীতিমতো চন্দ্রময়ীকে সে অপমান কর্‌তে সুরু ক'রে দিল।

খগেন তার উত্তরে ঘৃণিত কণ্ঠে বল্‌ল—ঠিক বলেছেন···ভদ্রঘরের মেয়ে হোক, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, মাগীটা যে-কোনো অন্যায় অনায়াসে কর্‌তে পারে। ওকে দেখলে শুধু গা ঘিন্ ঘিন্ করে না, গা ছম্‌ছমও করে! 'ফেরোসাস্ উয়োম্যান্'!

চন্দ্রময়ী নেমে এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল! এতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্তই সে নিঃশব্দে শুনেছে। নির্ব্বিচার অপমান তাকে এতটুকু আহত করে না!

নিরুপমার উদাসীন মুখখানির দিকে তাকিয়ে বিনীতা বল্‌ল—এতটুকু ওকে আমি বিশ্বাস করিনে, বুঝলেন বৌদি? কাশী হ'চ্ছে এই সব মেয়েমানুষদের উপযুক্ত জায়গা—মাকড়সার মতন এরা নানা জায়গায় জাল বেঁধে ব'সে থাকে। মেয়েমানুষ হ'য়ে মেয়েমানুষের কাছে নিজের কথা লুকিয়ে রাখবে—এত বড় ওর সাহস!

নিচে ভূপতি এবং তার বন্ধুরাও এবার সোরগোল ক'রে উঠ্‌ল। খগেন এসে বারান্দায় দাঁড়াল। নীচে থেকে ভূপতি বল্‌ল—ওই বাড়ীওয়ালীর কথা বল্‌ছেন ত'? আমরাও বল্‌ব মনে করেছিলাম। মাগীটা ইতরের একশেষ! দিন নেই, রাত নেই, আমাদের আশে-

পাশে কি মতলবে যে ঘুরে বেড়ায়—ভাবতে গেলে লজ্জায় মাথা হেঁট হ'য়ে আসে! বুড়ো মাগী, চুরি ক'রে খায়; তা' ছাড়াও অনেক গুণ—বুঝলেন না?

খগেন বল্‌ল—'ফাষ্ট ক্লাস ককেট'!—আমরা মেয়েছেলে নিয়ে ঘর করি ভূপতি বাবু, এ বাড়ী ছেড়ে দোবো!

বিনীতা বল্‌ল—বাবাকে দিয়ে আজ সকালেই আমি বাড়ী ঠিক করেছি, কালই আমরা চ'লে যাব।

ভূপতি বলল—আমাদেরও কন্‌শেসন টিকিটের সময় হ'য়ে এসেছে, শীগ্‌গিরই কল্‌কাতায় রওনা হ'চ্ছি!

চন্দ্রময়ী একে এসে সমস্তই শুন্‌ল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাবার সময় একটুখানি ম্লান হেসে ব'লে গেল—কি আর বল্‌ব মা, উঠে যাবে…তা যেও, ধ'রে ত আর রাখতে পারব না। তা ব'লে বাড়ীও কখনও খালি প'ড়ে থাকবে না…ছেলেপুলের মেয়ে-পুরুষে আবার ভর্ত্তি হ'য়ে যাবে! পরকে নিয়েই ত আমার ঘরকন্না!…কত মানুষ এখানে এল, কত মানুষই চ'লে গেল! বাড়ী আমার ধর্ম্মশালা!

অবসন্ন দিনের পাণ্ডুর আলোকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নিরুপমার চোখে যেন জল চক্‌ চক্‌ ক'রে উঠেছে। নিরুপমা মানুষের হৃদয়ের বিচার করে।

মনিব

পাশের ঘর থেকে বউটির কলকণ্ঠ দিনে অন্তত একশো বার শোনা যায়। হাসির উচ্ছ্বসিত আওয়াজটিই তার রূপ—তার ব্যক্তিত্ব। আর সরু ক'গাছি সোনার চুড়ির শব্দ তার লীলায়িত অঙ্গভঙ্গীর কথাই মনে করিয়ে দেয়। ওই হাসি শোনা যাচ্ছে আজ তিন মাস—দিনে রাতে অনর্গল।

একই বারান্দায় দুটি ঘর। মাঝখানে কাঠের আয়তনের মধ্যে শুধু একটি চিক্ টাঙানো। ওই হাসির শব্দে চিকের এ-ধারে বড় ঘরটির মধ্যে একা বসে বাবু-সায়েবের ভারি কাজের ব্যাঘাত হয়। সমস্ত দিনের গোলমালের মধ্যে ও-হাসি যদি বা এড়ানো যায়—রাত্রির নির্জ্জনতায় কিন্তু সে একটি বিচিত্র অপরিচিত বার্ত্তা নিয়ে কানে আসে! সরকারি 'সার্ভেয়ার' বাবু-সায়েব তখন কাগজের প্ল্যানের উপর থেকে মুখ তুলে চোখের উপর আলো রেখে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে অনুচ্চস্বরে বলে—আঃ!

বিরক্তি প্রকাশ এইটুকুর চেয়ে বেশি আর কোনোদিন শোনা যায় নি।

চিকটি তুলে একটি মেয়ে সকাল ও সন্ধ্যায় দু'পেয়ালা চা এনে দেয়। মেয়েটি ওই বউটিরই ঝি। কিন্তু ঝি-গিরি তার পেশা নয়। টেবিলের উপর পেয়ালাটি রেখে বলে—দিদি পাঠিয়ে দিলেন।

প্রতিদিন শুধু এই তিনটি কথা। কিন্তু প্রতিদিনকার এই নিরর্থক

কৈফিয়ৎ বাবু-সায়েবের প্রয়োজনে আসে না। প্ল্যানের উপর থেকে তার সুগভীর মনোযোগ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না, কথাও বলে না। অথচ পরদিন সকালে পেয়ালাটি খালিই দেখা যায়। মেয়েটি হয়ত কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নিঃশব্দে দাঁড়ায়, হয়ত মনোযোগী যুবকটির মুখের দিকে একবার তাকায়,—হয়ত বা নিজের এই ধন্যবাদবিহীন কাজটুকুর জন্য নিজেরই উপর একটু রাগ করে, তারপর আবার নিঃশব্দেই ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায়। তিনটি মাস ঠিক এমনি করেই মুখ বুজে চলে গেছে।

একদিন বলেছিল বটে,—দিদি আবার কি! মনিবের বউকে কেউ দিদি বলে না। নিজের বড় বোন ছাড়া কাউকে—

মেয়েটি সেদিন কিছুই উত্তর দেয় নি, বরং কথাটা শেষ হবার আগেই সে বেরিয়ে গিয়েছিল!

যাহোক, বউটি আজ চলে যাচ্ছে। স্বামীটি উঁচুদরের; তাই হাওয়া বদলাতে সস্ত্রীক এ-দেশে এসেছিলেন। জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা হ'লে গাড়ী ডাকতে পাঠিয়ে বউটি চিকের পরদাটি সরিয়ে এ-ধারে এল। ঘরের ভিতর মুখ বাড়িয়ে হেসে বল্‌লে—প্ল্যান্ আঁকা হচ্ছে বোধ হয়, ভেতরে একবার প্রবেশ কর্ত্তে পারি কি?

বাবু-সায়েব কাগজের উপর থেকে মুখ না তুলেই বল্‌লে—দরকার থাকলে আসবেন বৈ কি।

বেশ, আজ যাবার দিনেও এই কথা! দরকার আপনার সঙ্গে আমাদের শেষ হয়ে গেছে, মনে নেই? শুধু বিদায় নিতে এসেছিলাম।

গাড়ী তখন দরজায় এসে গেছে। সৌখীন চশমা-পরা স্বামীটি স্ত্রীর অপেক্ষায় ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে অন্যদিকে চেয়ে বোধ করি প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করছিলেন।

বউটি ঘরের ভিতর এসে একখানি চেয়ারের উপর ঝুঁকে পড়ে বল্‌লে—কলকাতা ছেড়ে অনেকদিন বিদেশে রইছি, এইবার তাই—সত্যি আপনাকে কিন্তু অনেক কষ্ট দিয়ে গেলাম, কিছু মনে করবেন না।

বাঃ সে কি, আপনারা আমায় চা খাওয়াতেন রোজ, সে কথা কি ভুলতে পারবো ?

কথাটিতে আঘাত পাওয়া উচিত। কিন্তু ওই সুন্দর প্রশান্ত যুবকটির কথাগুলো নাকি বরাবরই এমনি আখ্‌কাটা এ-কথা বউটি প্রথম আলাপ থেকেই বুঝতে পেরেছিল। তাই আস্তে আস্তে বল্‌লে—আপনার মেজাজ আজ যে রকম তাতে 'প্রফুল্লবাবু' না বলে আপনাকে বাবু-সায়েবই বলা উচিত !

আমাকে সকলে তাই বলেই ত ডাকে।—মুখের উপর হেসে প্রফুল্ল বল্‌লে।

আসি তা হলে—নমস্কার।—মেয়েটি বেরিয়ে যাচ্ছিলো, প্রফুল্ল উঠে গিয়ে বল্‌লে—শুনুন, একটু দাঁড়ান। একটা কথা বল্‌তে ভুলে যাচ্ছিলাম। ঘরভাড়ার বাকি হিসেবটা—ওঃ না না, মনে পড়েছে। টাকা কড়ি সমস্তই বুঝে পেয়েছি বটে।

বউটি যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে হেসে বল্‌লে,—এই জন্যেই আপনাকে আমাদের এত ভাল লাগতো। দর কসাকসি করে' ভাড়া আদায় কর্‌লেন, তাও বুঝি ভুলে যেতে হয় ?

বউটি পুনরায় শুধু বল্‌লে—হেসেই বল্‌লে বটে—আপনি একটি বিয়ে করুন প্রফুল্লবাবু, নৈলে আপনার এ মাথার রোগ সারবে না। বলে সে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। এই ক'টী কথা বলবার অধিকার বউটি হয়ত নিজের হাতেই করে' নিয়েছিল।

স্বামীটি প্রফুল্লর দিকে চেয়ে একটুখানি বিদায়ের হাসি হেসে বউটির অনুসরণ করলেন। গাড়ী ছুটে চললো।

কোনো কারণে বউটি যখন হাস্তো, মনে হত সে হাসির মধ্যে সংযম আছে, শৃঙ্খলা আছে ; কিন্তু অকারণ অনাবশ্যক খেয়ালি হাসি—সে যেন ঝড়, তার না-ছিল সীমা, না-ছিল বাঁধ। প্রফুল্ল ভাবতে লাগলো, প্রাণের সেই প্রাচুর্য্যটাই আজ শুধু নিঃশেষে থেমে গেল। তা ছাড়া আর কি!

ফিরে এসে সেই শূন্য ঘরটিতে প্রফুল্ল তালা বন্ধ করছিল, পিছন থেকে সেই মেয়েটি বললে—ঘরে চাবি দিচ্ছেন, ভেতরে আমার জিনিসপত্তর রয়েছে যে!

মুখ ফিরিয়ে প্রফুল্ল বললে—এ কি, তুমি গেলে না ওঁদের সঙ্গে ?

আমি যাবো কোথায়, আমি যে এখানেই থাকি। ওঁদের কাজ করবার লোক ছিল না তাই আমায় রেখেছিলেন।—সরুন, পুঁটলিটা বার করে নিয়ে আসি।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে প্রফুল্ল বল্‌লে—ঝিয়ের আবার জিনিসপত্তর কিসের ?

হেসে মেয়েটি বল্‌লে—বা রে, সে কি মানুষ নয় ?—ছাড়ুন, পথ ছাড়ুন।

ঘরে ঢুকে মেয়েটি একটি পুঁটলি বার করে নিয়ে এল। পরে পা বাড়াতেই প্রফুল্ল বলে উঠলো—চলে যাচ্ছ নাকি ?

তা আর কি করবো বলুন! চাক্‌রি গেল, এবার—

যাও তবে।—বলে প্রফুল্ল ঘরে ঢুকে নিজের কাজে মন দিল। মেয়েটা চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়ালো, পরে একটা নিশ্বাস ফেলে নেমে এক-পা এক-পা করে চলতে লাগলো।

বেশী দূর যায় নি—ফিরে দেখে তারই উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে প্রফুল্ল ডাক্‌ছে।

মেয়েটা আবার ফিরে এল। প্রফুল্ল বললে—চলে যে যাচ্ছ, আমায় চা দেবে কে?

চা কি আমি দিতাম? তাঁরাই ত পাঠাতেন!

তা জানি, তবু তুমিই এনে দিতে কিনা তাই বলছি।

তা কি করবো বলুন? দু'বেলা আপনাকে চা খাওয়াবার মতন পয়সা ত আমার নেই!

হুঁম্—তুমি রাঁধতে জানো?

রান্নাই ত আমার কাজ।

বয়স কত তোমার?

মেয়েটা এবার হাস্‌লে। বললে—বয়স যতই হোক, রাঁধতে আমি ভালই জানি।

তবু শুনি, আমার চেয়ে কত ছোট সে হিসেবটা করে রাখি।

উনিশ।

উনিশ? এত? আমি মনে করি সতেরো-আঠারো। আমার বয়েস পঁচিশ হ'ল। অনেক বড় তোমার চেয়ে। আমায় মান্য করে চ'লো।—নাম কি তোমার?

মেয়েটি নত মস্তকে বললে—দামিনী।

প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ বল্‌লে—দেখ দামিনী, আমার সুবিধের জন্যই তোমায় রাখবো। কাজ-কর্ম্ম সমস্তই আমার করা চাই। খাওয়া-পরা পাবে। মাইনে কিছু দিতে হবে না কি? ওরা কি তোমায় মাইনে দিত?

নৈলে আমি থাকবো কেন; দশ টাকা করে পেতাম।

দশ টাকা! এমন বেহিসেবী কেন তুমি? মাইনে পাই পঞ্চাশ টাকা, তার মধ্যে দশ টাকা যদি তোমায় মাসে দিই তা হলে তুমিই বা কি খাবে, আমিই বা কি ছাই খাবো? ভবিষ্যতের জন্য জমাবোই বা কি!

তা হলে পাঁচ টাকা করে দেবেন!

না,—তোমার কথাও থাক্ আমার কথাও থাক্—সাড়ে চারটি করে' টাকা মাসে পাবে, আর আট আনা করে বক্‌শিষ মাসে দেবো।

পুঁটলিটি নামিয়ে দামিনী হেসে রাজি হ'ল। প্রফুল্ল বল্‌লে—যাও রান্নাবান্না করগে,—আগে এক পেয়ালা চা এনে দাও। চা তুমি ভালই কর্ত্তে পারো,—আর একটা কথা বলে রাখি, আমি কোনদিন ঝি-চাকর রাখি নি। আজ মনিব হ'তে পেরে আমার বেশ লাগছে দামিনী।

দামিনী বল্‌লে—শুনে খুসি হলুম। কিন্তু ওদিকে ঘরে যে আপনার কিছুই নেই! রাঁধবোই বা কি, চা করবোই বা কি দিয়ে? আপনাকে দুবেলা বাজারে গিয়ে খেয়ে আসতে হয়, তা মনে আছে ত?

আছে।—তারপর ভুরু কুঁচ্‌কে প্রফুল্ল বল্‌ল—আচ্ছা ঘরে যে আমার কিছু নেই তা তুমি খবর পেলে কি করে? যারা গোয়েন্দাগিরি করে তারা লোক ভাল নয় দামিনী। যা হোক—এবারের মতন তোমার ক্ষমা করলাম। বাজারের এখন কি কি আনতে হবে—না না, ঝিয়ের কাছে কোনও পরামর্শ আমি—বুঝে-সুজে আন্‌তে পারবো।—বলে' প্রফুল্ল ভিতরে ঢুকে বাক্স খুলে পয়সা হাঁটকাতে লাগলো।

একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে দামিনী বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল, প্রফুল্ল আবার বেরিয়ে এসে বল্‌লে—মাসের শেষ কিনা, পয়সা আর থাকবে কোথা থেকে? তোমার কাছে কিছু আছে দামিনী?

দামিনী বল্‌লে—আছে দশ টাকা।

দাও দেখি?

টাকা কটা হাতে নিয়ে প্রফুল্ল বল্‌লে—তোমার কাছে হাত পেতে যে আমি টাকা নিলাম তার জন্য কৃতজ্ঞ থেকো।

দামিনীর রাগ হয়েছিল। বল্‌লে—তবে দিন্ আমার টাকা ফিরিয়ে, আমি বাড়ী চলে যাই।

প্রফুল্ল একটু দ'মে গিয়ে বললে—ফেরত দিই যদি তাহলে বাজার করবো কি দিয়ে! দুজনে আমরা খাবোই বা কি!

তবে যা খুসি করুন।—বলে' দামিনী রান্নাঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো।

বাঙ্‌লার বাইরে এই পার্ব্বত্য দেশে প্রফুল্ল যে বরাবর থাকে তা নয়,—জেলা-বোর্ডের রাস্তা তৈরী হচ্ছে, সে এসেছে সার্ভেয়ার হয়ে। এর আগে কোথায় যে ছিল,—তার কথা মনে করাও তার কাছে ভারি কঠিন।

দামিনী বলে—ঘর আপনার কি নোংরাই হয়েছিল, সাতজন্মে পরিষ্কার করবার কথা বোধ হয় আপনার মনেই হত না?

এ-কথার উত্তর দেবার প্রয়োজন প্রফুল্ল মনেই করে না। কাগজের উপর পেন্সিল্ আর স্কেল্ দিয়ে কি আঁকে—সেই দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে।

দামিনী চা এনে টুলের উপর রেখে দেয়। পরে রান্নাঘরে গিয়ে উনুনের উপর তরকারি চড়িয়ে যখন সে ফিরে আসে, দেখে—যেমন চা তেমনই পড়ে আছে। চৌকাঠের কাছে খানিকক্ষণ চুপ করে সে বসে থাকে, পরে একটু অসহিষ্ণু হয়েই বলে—চা যে জুড়িয়ে গেল আপনার, গরম চা খাবার অভ্যেস।

উহুঁ—কেন কথা কও কাজের সময়?—প্রফুল্ল এইবার মুখ তোলে। বলে—কাল একটা ঘণ্টা কিনে এনে দেবো, দরকার হলে আমার সঙ্গে কথা না কয়ে' ঘণ্টা বাজাবে।

মুখ ভার করে' দামিনী বলে—ঘণ্টা ত' রোজই আপনি একটা করে' এনে দিচ্ছেন! তা বলে' আমি ত' আর জেল খাটতে আসি নি।—উঠে ফর্ ফর্ করে' সে চলে যায়।

যায় বটে কিন্তু একা রান্নাঘরে চুপ করে বসে থাকতে তারও ভাল লাগে না। —নিঃশব্দে চৌকাঠের একটু আড়ালে পুনরায় এসে চুপ করে প্রফুল্লর কাজের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

যে ঘরে বউটি থাকতো সেই ঘরটীতেই রাত্রে দামিনী শোয়।

প্রফুল্ল হঠাৎ একদিন সে ঘরে ঢুকে বল্‌লে—বাঃ! দিব্বি নিজের ঘরটী সাজিয়েছ ত'? ছবি, ক্যালেণ্ডার, আয়না—এ সব আমারই ঘর থেকে আনা হয়েছে দেখছি। না বলে' কয়ে' পরের জিনিসে হাত দেওয়া,—তা' ভালই করেছ—এ সব জঞ্জাল আমার ঘরে থাকবার দরকার নেই। কিন্তু যেদিন ছেড়ে যাবে, সেদিন এ সমস্ত আবার আমায় ফিরিয়ে দিয়ে যেয়ো দামিনী।

দামিনী তখন লজ্জায় রান্নাঘরে পালিয়েছে। মুখটি তার রাঙা হয়ে উঠেছিল!

প্রফুল্ল বল্‌তে লাগলো—এর মধ্যে কোনোদিন আমার ভাড়াটে যদি আসে তা' হ'লে কিন্তু তোমায় এ ঘর থেকে সরিয়ে দেবো। —এ কি, বিছানাটা যে বেশ ধব্‌ধবে। আমার মতো ভাল বিছানা তোমার নেই বটে কিন্তু ঝিয়ের বিছানা বলে' ত' ঠিক মনে হচ্ছে না! এ সব কোথা থেকে এল!

রান্নাঘরের কাছে এসে পুনরায় বল্‌লে—দেখ দামিনী, তোমার চাদরখানা তুলে আমার বিছানায় পেতে দিয়ো—বুঝলে? অত ফর্সা চাদরের ওপর শোয়া তোমার ভাল দেখায় না। লোকে দেখলে মনে কর্‌তে পারে, আমিই তোমায় দিইছি।

দামিনী বল্‌লে—গরীব লোকের এমনি দুর্ভাগ্যই বটে।

সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে নিজের চাদরখানি প্রফুল্লর বিছানায় পাতবার আগে দামিনী বল্‌লে—আমার চাদর আপনার বিছানায় পাতলে আপনার আপত্তি হবে না?

কেন? অমন ধব্ধবে—

ধব্ধবে হোক—তবু বিয়ের চাদর ত'—

প্রফুল্লর মুখখানা যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল! একটা ঢোক গিলে বল্‌লে—তাই তো দামিনী, এ কথাটা ঠিক আমার মনে ছিল না। তা' হ'লে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তোমাকে সকল বিষয়ে ছোট করে' দেখবো আর তাচ্ছিল্য করবো—এ দুটো কথা আমার নোটবুকে না লিখে রাখলে আর চলে না দেখছি। রোজ সকালে নোটবুক দেখবার সময় যেন—

দামিনী একটু হেসে বল্‌লে—আমার কথা লিখে লিখে আপনার নোটবুক যে ভরে উঠ্‌লো। বলে সে চাদরখানি আবার নিজের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

ঘরে আলো নেই। অন্ধকারে ভিতরে ঢুকে চাদরখানি কোলের ভিতর নিয়ে অকারণে দামিনীর চোখে জল এল। সে অশ্রু একান্ত নিঃশব্দে, নির্জ্জন রাত্রির গোপনতায়—সবার চোখের আড়ালে।

অনেকক্ষণ পরে উঠে দরজা বন্ধ করে সে শুয়ে পড়লো।

রাত তখন ঘন-গভীর। প্রফুল্লর ডাক শুনে সে ধড়মড় করে উঠে আবার দরজা খুল্‌লে। দেখে কাঁধের উপর একরাশ কম্বল, বিছানা, লেপ নিয়ে মনিব দাঁড়িয়ে। দোরের কাছে নামিয়ে দিয়ে প্রফুল্ল বল্‌লে—এইগুলো পেতে আজকের মতন শোও, কাল থেকে অন্য ব্যবস্থা করে দেবো।

দামিনীর চোখে তখনও ঘুম ছাড়ে নি। বল্‌লে—আমার জন্য এত রাতে এ সব কেন আনতে গেলেন?

আন্‌বো না? ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করে যদি?

আমাদের অসুখবিসুখ করে না।

যদি করে তা' হ'লে আমি ত' আর ঝিয়ের জন্যে ওষুধের টাকা খরচ করতে পারবো না দামিনী?—বলে প্রফুল্ল নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

সমস্ত রাত্রি সেদিন খোলা দরজার কাছে দামিনী চুপ করে' বসে রইলো।

রান্নাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে প্রফুল্ল বলে—কি হয় কি এ ঘরে তোমার বসে' বসে'?

কথা শুনলে গা যেন জ্বলে উঠে। দামিনী প্রথমে কথা কয় না।

চুপ ক'রে রইলে যে? কথার জবাব দেওয়া দরকার মনে কর না বুঝি?

কটুকণ্ঠে দামিনী বলে—কি হয় এখানে দেখতে পান্ না?

যেটা দেখতে পাই সেটার কথা হচ্ছে না, দেখতে যেটা না পাই তার কথাই বলছি।

মুখ তুলে দামিনী বলে—আপনার ওসব হেঁয়ালি আমি বুঝিনে।

তা' বুঝবে কেন,—চুরি ক'রে খাওয়াটা কিন্তু খুব বোঝ—কেমন?

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দামিনী অকস্মাৎ যেন পাথর হয়ে গেল!

প্রফুল্ল বলতে লাগলো—মেয়েমানুষ রান্নাঘর এত ভালবাসে কেন তা আমি জানি। কিন্তু এক মাসের ভাঁড়ার যা এনে দিয়েছি তা যেন দু' মাস হয়, এই আমি বলে রাখলাম। দামিনী, পরের বাড়ীতে থাকতে গেলে চুরি করে খাওয়াটা ছাড়তে হয়।

প্রফুল্ল আবার এসে নিজের ঘরে বসলো এবং মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেকার কথাগুলো সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে নিজের কাজে তন্ময় হয়ে রইলো।

মিনিট কয়েক পরে ঘরে ঢুকে দামিনী বললে—মাইনে পত্তর আপনার কাছে কিছু চাইনে, ধারের দরুণ সেই দশটা টাকা চুকিয়ে দিন্, এখুনি আমি চলে যাবো।

প্রফুল্ল যেন আকাশ থেকে পড়লো। বল্‌লে—কেন ?

আমার এখানে থাকা হবে না।

সে কি! আমি থাকতে পারি আর তুমি পারো না ?

না। চুরি করে খাওয়ার বদনাম কোনো মেয়েই সহ্য কর্‌তে পারে না।

ওঃ সেই কথা। এই ত' তোমাদের দোষ, সত্যি কথা বল্‌লেই তোমরা রেগে যাও। যাই হোক, এতে তুমিও যে রেগে যাবে এ কথা আমার মনে হয় নি। তোমার মতি-বুদ্ধি যাতে ভাল থাকে সেই জন্যই বল্‌ছিলাম। আর এই গ্যাখো, পয়সা কড়ি যেখানে সেখানে রেখে আমি ভুলে যাই, তুমি পাছে চুরি করো এ জন্যে কত সাবধানই করি কিন্তু—

আমাকে চোর জেনেও এতদিন রেখেছেন কেন ?

তা কি আর জানি,—শুনেছি, এদেশের সব মেয়েই চোর, পুরুষরা ভাল।

ফুল্‌তে ফুল্‌তে দামিনী বল্‌লে—মানুষকে ডেকে এনে আপনি এমনি অপমান করেন ?

অপমান! এতে অপমানের কথা কি আছে শুনি ? আর মনিবে অপমান একটু কল্লে সেটা কি গায়ে মাখা উচিত ? দামিনী তুমি ভারি ছেলেমানুষ।

দামিনী তেমনি ভাবেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খানিক্ বাদে খাবার সময় হলে প্রফুল্ল গিয়ে দেখে, রান্না-বান্নার চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। উনুনে জল ঢালা, কাঁচা তরকারী ছড়িয়ে রয়েছে,

চাল ভিজানো—চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। এ ঘরে এসে দেখলে,—দামিনী চলে যাবার জন্য প্রস্তুত—পুঁটলি বাঁধছে।

মুখ বাড়িয়ে বল্‌লে—যাচ্চো তা' হ'লে? বেশ, সাবধানে সুখ-স্বচ্ছন্দে থেকো। এখানে একটু কষ্টই পেয়ে গেলে বৈ কি। খাওয়ার কষ্টই পেয়েছ, সময়ে খেতে পাও নি।—একটু থেমে আবার বল্‌লে—আর একটা লোক আমায় দেখে শুনে রাখতে হবে আর কি! এবার আর ঝি নয়,—চাকর, নইলে যখন তখন ধম্‌কানো চলে না—দেখা যাক্। কিন্তু দামিনী, যাবার আগে রেঁধে-বেড়ে এক পেয়ালা চা করে দিয়ে···আর ওই ঘরের জঞ্জালগুলো—আর যদি নাই পারো, জোর করবার কি আছে!

প্রফুল্ল একবার বেরিয়ে গেল। একটু পরেই আবার ঘরে ঢুকে বললে—এই নাও সেই টাকা দশটা—ভারি অসময়ে দিয়েছিলে।—ভাল কথা, খুব সাবধান, তোমার পুঁটলির মধ্যে আমার জিনিষ পত্র যেন কিছু বেঁধে নিয়ে যেয়ো না—বুঝলে? দাও—ও-গুলো সবই আমার, এগিয়ে দাও এদিকে।

দামিনী সেগুলো হাতে করে' ঠেলে দিয়ে বল্‌লে—আমার পুঁটলিটা না হয় একবার দেখে নিন্ যদি সন্দেহ থাকে।

সন্দেহ আর কি! মনিবের কাছে তুমি কি আর মিছে কথা বলবে?

দামিনী বল্‌লে—এ-দেশের মেয়েরা তা' বল্‌তে পারে। আমরা যেমন চোর তেমনি মিথ্যেবাদী।

প্রফুল্ল বল্‌লে—তুমি ত' এ-দেশের মেয়ের মতন নও দামিনী?—একটু হেসে আবার বল্‌লে—এ কিন্তু বেশ আমার লাগছে। আমার জিনিষ তোমার কাছে ফেরৎ নিচ্ছি আর তোমার জিনিষ তুমি আমার কাছে ফেরত নিলে।

আপনার কাছে আমার কিই বা ছিল যে ফেরত নেবো ?

চিন্তিত মুখে প্রফুল্ল বল্‌লে—সত্যি, কিছু ত' ছিল না। গরীব লোক তুমি, আমার কাছে তোমার কিই বা থাকবে। অথচ একবার কি মনে হচ্ছিল শুনবে ? শুনে কিন্তু হাসবে তুমি !

দামিনী পুঁটলিটি নিয়ে বেরিয়ে এল। বল্‌লে—শোনবার আমার দরকার নেই। বেলা যাচ্ছে—বলে' পথে গিয়ে নামলো।

প্রফুল্ল বারান্দার উপর থেকে বল্‌লে—আমার জন্যে ভেবো না, বেশ থাকবো। ববং তোমারই জন্যে আমার চিন্তা! এতদিন আমারই আশ্রয়ে তুমি ছিলে !

বলে' সে ঘরের মধ্যে ঢুকে একমনে নিজের কাজে বসে' গেল।

চোখের জলে দামিনীর সুমুখের রাস্তা তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে।

সার্ভেয়ারী কাজের ঝকমারী। অঙ্ক কসো আর প্ল্যান আঁকো। কিন্তু এই কাজ প্রফুল্লর ভাল লাগে। অঙ্কে তার মাথা ভারি খেলে। সম্প্রতি সম্মান এবং অর্থের দিক দিয়ে এ জন্যে তার উন্নতিই হয়েছে।

পড়ন্ত বেলা। গাছে-পালায় রোদ আই-ঢাই করছে। সারাদিন উপোস করে কাজের যেন আর কামাই নেই। আর কাজ কি তাই সদর রাস্তার উপর ? মাপের ফিতে হাতে নিয়ে লোকের আনাচে কানাচেও ঘুরতে হয় বৈকি। হাঁটুর উপর কাপড় তুলে অখণ্ড মনোযোগের সহিত প্রফুল্ল মাপ কচ্ছিল, জায়গাটা কত ফুট লম্বা, কত ফুট চওড়া।

এমন সময় সুমুখের চালা ঘর থেকে দামিনী বেরিয়ে এল। দেখে ত প্রফুল্ল অবাক্। বল্‌লে—এইখানো থাকো ? বেশ ফুলগাছ দেয়া বাড়ী ত ? ভাল আছ ? অনেক দিন দেখি নি। ভারি রোগা হয়ে গেছ কিন্তু।

দামিনী এদিক ওদিক চেয়ে চুপি চুপি বল্‌লে—এত বেলা অবধি না খেয়ে কাজ করেন আপনি?

কি আর করি বল! তা তোমার আসবার পর থেকে আমি বেশ আছি। তেমনি বাজারে গিয়ে খাই, একা একাও বেশ থাকতে ভাল লাগে।—এসো দেখি একবার এদিকে, ফিতেটা একবার ধরলে তাড়াতাড়ি কাজটুকু হয়ে যাবে। কুলি বেটারা সব ক্ষিধের চোটে পালিয়েছে। আমার কাছে কোনো কুলিই থাকতে চায় না, কেন বল ত' দামিনী?

দামিনী ফিতেটা ধরে বল্‌লে—বোধ হয় ভাল লোকের কাছে টেঁকতে পারে না! ছোট জাত যে!

আমি ভাল লোক!—প্রফুল্ল হেসে বল্‌লে—এবার তুমি নিশ্চয় ঠাট্টা করেছ দামিনী,—তোমার চলে আসবার পর থেকে নিজেকে আমি খানিকটা চিন্‌তে পেরেছি! আমি হিসেবি লোক বটে কিন্তু ভালো লোক নই।

মাপ-জোকের কাজ হয়ে গেলে দামিনী সরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, এত জায়গা থাকতে আমারই দোরগোড়ায় আপনার কাজ পড়ে' গেল? এর বোধ হয় দরকার ছিল না, তাই কুলিরা চলে গেছে।

প্রফুল্ল রেগে উঠলো। বল্‌লে—তবে কি বলতে চাও তোমাকে দেখবার ছল্ করে' এখানে এসেছিলাম!

জিব কেটে দামিনী বল্‌লে—ছি ছি, আপনি কি সেই ধাতের লোক? না কি আমারই এত বড় সৌভাগ্য!—যান্—বেলা পড়ে গেছে, বোধ হয় হাট থেকে আপনাকে খাবার কিছু নিয়ে যেতে হবে যাবার সময়!

প্রফুল্ল হঠাৎ বল্‌লে—তোমাকে আর ঝি বলে মনে হয় না দামিনী।

তবে ?

মনে হচ্ছে তোমাতে-আমাতে কোনো তফাৎ নেই।

মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চেয়ে দামিনী বল্‌লে—যান্ আপনি।

একটুখানি গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে প্রফুল্ল বল্‌লে—তোমার হাতে খাওয়ার পর থেকে আমার বাজারের খাবার আর রোচে না দামিনী, তা বলছি।

তা আর কি করবেন বলুন।

প্রফুল্ল বল্‌লে—সেই কথাই বলছিলাম—বুঝলে ? এই ধর এখন আমার চা খাবার সময়। ঘরে গিয়ে আবার কি চা খাবার জন্যে এতদূরে—দামিনী, আমার ঘরে গেলে দেখতে পেতে এক হাত উঁচু জঙ্গল জমে আছে। সব অগোছালো, কোথায় কি থাকে কিছুই খুঁজে পাই না। এত কাজ আমার কেই বা করে!—যাবে দামিনী আমার ওখানে ? বক্‌শিস্ না দিয়ে বরং আট আনা তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেবো—কেমন ?

দামিনী বল্‌লে—আমার মাইনেও চাইনে—বক্‌শিসেও দরকার নেই,—আপনি কথাগুলো একটু বুঝে-সুঝে কইবেন, তা হলেই—

মাইনে চাইনে ?—ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে প্রফুল্ল বল্‌লে—তবে থাক, তোমার গিয়ে কাজ নেই,—মতলব তোমার ভাল নয়। পরিশ্রম করে যারা পয়সা নেয় না, বড় স্বার্থ কিছু তাদের থাকে—এ আমি জানি।

দামিনী মুখ টিপে হেসে বল্‌লে—এত বড় হিসেবী লোক আপনি, না জানেন কি !

প্রফুল্ল বল্‌লে—মাইনে তোমায় নিতেই হবে দামিনী,—তোমার পরিশ্রমের পয়সা না দিলে আমিই কি সুখে থাকতে পারবো মনে কর ? আমি ঝগ্‌ড়াটে, আমি একগুঁয়ে, আমি নির্ব্বোধ কিন্তু সাধারণ বিষয়-

বুদ্ধিতে তোমার চেয়ে খুব বেশী খাটো নই।—পাঁচটা টাকা মাইনে তোমার উপযুক্ত মোটেই নয়, কি জানি কেন হাত তুলে দিতে আমার হাত কাঁপে; তবুও তা নিতে তুমি অমত করো না লক্ষীটি।—এসো, আর দেরী ক'র না, অন্ধকার হলে আর পথ চিন্‌তে পারবো না হয় ত।

ভয় নেই, আমি চিনিয়ে নিয়ে যাবো।—দাঁড়ান, পরণের কাপড় দুখানা চট্ করে নিয়ে আসি।

দামিনী ভিতরে ঢুকে একটু পরেই বেরিয়ে এল। পথ চলতে চলতে নিজের চাকরির দুর্ভোগ সম্বন্ধে প্রফুল্লর কত কথা। পরে এক সময় মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে—দামিনী, তোমার কথাই ঠিক, তোমার দরজার কাছে আমার বিশেষ কিছু কাজ ছিল না—এমনিই এসেছিলাম।

স্বল্প অন্ধকারে পিছন থেকে দামিনীর হাসির শব্দ শোনা গেল।

গম্ভীর হয়ে প্রফুল্ল বল্‌লে—হাস্‌লে যে? এ ত হাসবার কথা নয়। আমার চেয়ে বয়সে তুমি ছোট—আমার ঝি! মনিবকে মান্য না করে তার মুখের ওপর হাস্‌লে কি বলে'?

মুখের হাসি দামিনীর মিলিয়ে গেল। হঠাৎ আঘাত পেয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লে—আপনাকে আর মনিব বলে' মনে হয় না!

প্রফুল্ল বল্‌লে—বাঃ। এ দেখছি আমারই কথা চুরি করেছ।—জানি আমি, নিজের কথা চেপে রেখে মেয়েরা পরের কথা চুরি করে বলে। মেয়ে জাতটা হচ্ছে পাকা চোর!

তাড়াতাড়ি প্রফুল্ল পথ চলতে লাগলো!

দামিনীর আবার ঘরকন্না। এ ঘরের সঙ্গে যেন তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ক'দিন যেন বেড়াতে গিয়েছিল—আবার ফিরে এসেছে! দু'জনের দু'খানি ঘর আবার পরিপাটি করে সাজালে।

প্রফুল্ল তারিফ করে। বলে—মেয়েমানুষের কি হাত! চারদিক যেন হাসচে। আমি ত এত পরিশ্রম করি কিন্তু এমন ত'—

দামিনী টুলের উপর দাঁড়িয়ে ছবি টাঙাতে থাকে। পিছন থেকে তার দিকে চেয়ে চেয়ে প্রফুল্ল বলে—সত্যি বল্‌ছি, দামিনী, মেয়েরা থাকলে ঘর যেন ভরাট্‌ থাকে। এই তুমি কদিন ছিলে না, আমার মনে হচ্ছিল—

হাতখানা ঘুরিয়ে দামিনী পিঠের কাপড়টা কাঁধের উপর টেনে দেয়। পরে ছবি টাঙানো হলে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে তাকায়। বলে—কেমন হ'ল এবার বলুন ত?

প্রফুল্ল বলে—কার জন্য টাঙালে তার ঠিক নেই,—আমার ত মুখ তোলবারই সময় হয় না!—আচ্ছা, এত ঠাণ্ডায় তুমি একটি জামা গায়ে দিতে পারো না দামিনী? অসুখ করবে যে! তখন ত আমাকেই—

হাত দুটির উপর কাপড় ঢাকা দিয়ে দামিনী তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

খেতে খেতে মুখ তুলে প্রফুল্ল বলে—বয়স হলে মেয়েদের বিয়ে হয় জানি। তোমার হয় নি কেন দামিনী?

দামিনীর মুখটা রাঙা হয়ে ওঠে। বলে—জানি না ক'।

আমার বোধ হয়, গরীব লোক বলে' তাই। কিন্তু চেহারা ত' তোমার নেহাৎ—

মুখ ফিরিয়ে হেসে দামিনী তাকায়।

না, সে কথা বলতে নেই।—বলে' আহার অসমাপ্ত রেখেই প্রফুল্ল উঠে চলে যায়।

বিকালে খাটের উপর বসে সে চা খায়, আর দামিনী বসে' বসে' তখন ঘরে ঝাঁটা দেয়। দামিনী বলে—টেবিলের ওপর ওই যে সব কাগজ ছড়ানো রয়েছে, ওতে আপনি প্ল্যান্‌ আঁকেন বুঝি?

হ্যাঁ, প্ল্যান্ আঁক্‌তে হয় আর আঁক্ কস্‌তেও হয় অনেক। ড্রয়িংও আছে।

ছবি-টবি আঁক্‌তে হয় না?

চায়ের ঢোক গিলে প্রফুল্ল বলে—দূর্ পাগল! ছবি আঁকার কি দরকার?

এইবার দামিনী মুখ ফিরিয়ে বলে—তবে কাগজের ওপর পেন্সিল দিয়ে অতগুলো মেয়ের ছবি এঁকেছেন কেন?

মেয়ের ছবি এঁকেছি? কক্ষণো না।—কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই উত্তেজিত হয়ে প্রফুল্ল বলে উঠলো—জেলা-বোর্ডের কত ফরমাসি কাজ আছে তুমি তার কি জানবে?

তারা বুঝি মেয়েদের ছবি আঁক্‌তে বলে?

তা বলে না? নিশ্চয় বলে।- চল বরং ভজিয়ে দিচ্ছি, চল আমার সঙ্গে।

দামিনী কাজ সেরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ উঠে রাগ করে কাগজগুলো ছিঁড়ে বাইরে ফেলে দিলে, পরে বললে হিংসে, ও সব হিংসে! মেয়েদের ছবি পর্য্যন্ত কাছে থাকা মেয়েরা সহ্য করতে পারে না।

পরে মুখ বাড়িয়ে বললে—কাল থেকে আমার ঘরে ...র তুমি ঝাঁটা দিতে এস না দামিনী।

কথাটা হাওয়ায় ভেসে গেল।—

প্রফুল্লর কিন্তু রাগ পড়ে না। বিকালে আফিস থেকে এসে চেয়ারে বসে পড়ে বলে—সারাদিন খেটে-খুটে এলাম, কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে একবার দেখা নেই! সব কাজ যদি আমার না-ই করবে তবে ঝি রাখা কি জন্যে?

দরজার পাশেই দামিনী দাঁড়িয়ে থাকে। ভিতরে এসে বলে—কি চাই আপনার, বলুন ?

সব কথাই বলতে হবে তোমায় ? বুঝে নিতে পার না ? এই যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এলাম—হাতপাখাটা নিয়ে একটু বাতাস দিলেও ত পারো ? তোমার আর কি দামিনী, বসে বসে খাওয়া বৈ ত নয়।

দামিনী বলে—এত ঠাণ্ডায় বাতাস খেতে ইচ্ছে হয় ?

হয় ! সারাদিন পরিশ্রম করে এসে—আচ্ছা, না হয় বাতাস নাই দিলে, তা বলে এই জুতোর ফিতেটাও ত খুলে দিতে পারো ?

পরিশ্রম আপনাকে কত কর্ত্তে হয় তা আমার জানা আছে—বলে দামিনী সরে এসে তার পায়ের কাছে বসে জুতোর ফিতে খুলে দেয়।

প্রফুল্ল বলে—মোজাটা অমনি খুলে দিতে কি তোমার হাতে ব্যথা হয় ?

মোজা খোলা হয়ে গেলে বলে—গলায় আমার পৈতে আছে, পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিলে তোমার জাত যাবে না দামিনী।

দামিনী বসে বসে মুখ তুলে স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাসি হেসে ঠোঁটের উপর দাঁত চেপে ধরে। পরে বলে—বেশ ত আপনি ? এ রকম সেবা করবার কথা ত ছিল না আমার সঙ্গে ?

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রফুল্ল বলে—মেয়েমানুষ এমনিই বটে ! কেবল দোকানদারী ! কতটুকু কথা ছিল আর কতটুকু ছিল না—এ নিয়ে ত তোমার সঙ্গে আমারও লেখাপড়া হয়নি ? তা' ছাড়া তুমি ত আমার সেবা করছ না—কাজ করছো। পায়ে হাত বুলোনোও একটা কাজ। সেবা করবার অধিকার তোমার নেই।

তবে সে কাজ আমার শেষ হয়েছে।—বলে দামিনী উঠে বেরিয়ে যায়।

প্রফুল্ল বলে ওঠে—ওঃ! নরম হাতের কি অহঙ্কার! মেয়েমানুষ কিনা!

দামিনীর চোখে ততক্ষণে জল দেখা দিয়েছে।

অনেক রাত অবধি আলো জ্বেলে প্রফুল্ল কাজ করে। প্ল্যান আঁকে, ড্রয়িং করে—আঁকও কসে। ওদিকে দামিনী রেঁধেবেড়ে দোরের কাছে চুপ করে বসে থাকে।

চুপ করেই থাকতে হবে, কথা বল্‌বার নিয়ম নেই। কিন্তু সে নিয়ম মনিব যদি ভাঙে ত আলাদা কথা।

হয়ও তাই। প্রফুল্ল তার হাতের কাগজখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে—আলোটা বাড়িয়ে দেয়। পরে বলে—দেখো ত দামিনী, সরে এসে একবার দেখ ত'।

উঠে গিয়ে দামিনী বলে—কি দেখবো?

কাগজখানা দেখিয়ে প্রফুল্ল বলে—ধর, রাস্তাটা ঠিক সোজা যেতে যেতে হঠাৎ এক সময় বাঁক নেয়—একেবারে হঠাৎ—

তারপর?

কিন্তু হঠাৎ মোড় ফেরানো ত চলে না, তাই রাস্তাটা সোজাও থাকবে অথচ এঁকেবেঁকে যাবে। এই ছাখো, এদিকে পাঁচ ফুট আর ওদিকে ধর তিন-তিরিক্‌খে—আঃ এত স'রে আসতে তোমায় কে বললে? একেবারে গায়ের ওপর পড়ছ যে—

দামিনী পিছিয়ে গিয়ে একটু দাঁড়ায়—মুখের দিকে একবার তাকায়, পরে বলে—খাবার ঢাকা রইলো। আমার ঘুম এসেছে—চললাম।

খাবে না? এর পর তোমার খাবার নিয়ে আমায় বসে থাকতে হবে নাকি?

দামিনী নিঃশব্দে চলে যায়।

খাওয়া দাওয়ার পরে খানিক রাতে প্রফুল্ল গিয়ে তার হাত ধ'রে

তুলে আনে। বলে—এর চেয়ে বেশী অনুরোধ করলে আমার আর এতটুকু আত্মসম্মান থাকবে না দামিনী—তা বলছি।

খাবারের কাছে দামিনীকে বসিয়ে সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

সেই রাতেই। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলো শিশু-গাছের ফাঁক দিয়ে খানিকটা জানলার কাছে এসে পড়েছে। এই চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে পদ্মের কোরক কাঁপে—বকুলের ঘুমন্ত পুরী প্রথম পলক মেলে।

রাত বোধ হয় আর বাকি নেই। কিসের যেন খস্ খস্ শব্দে প্রফুল্ল আচমকা জেগে উঠলো। ঘুম তার ভারি সজাগ—চোরের ভয়ে রাতে তার ঘুম হয় না। মাথার কাছে টিম্‌টিমে আলোটা বাড়িয়ে সে দ্রুতপদে উঠে বাইরে এল।

দামিনী ততক্ষণে নিজের ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ কচ্ছে। ছুটে গিয়ে প্রফুল্ল ডাকলে—দরজা খোল দামিনী।

এ কণ্ঠের সঙ্গে দামিনীর পরিচয় ছিল না। ভয়ে ভয়ে আবার দরজাটা খুলে মাথা হেঁট ক'রে সে দাঁড়ালো।

প্রফুল্ল বললে—মশা মাছির শব্দে আমি জেগে উঠি তা জানো?

দামিনী চুপ।

এত রাতে আমার ঘরে ঢুকেছিলে কি জন্যে? রাগে প্রফুল্ল ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলো। বললে—চুরি করবার আর জায়গা পাও নি? অবশেষে আমার ঘরে? প্রথম থেকেই চোর বলে যে তোমায় সন্দেহ করছিলাম সে কি আমার ভুল? অঙ্ক ক'সে ক'সে মাথা আমার জলের মতন পরিষ্কার তা জানো? এক চাউনিতেই মানুষকে চিনে ফেলতে পারি।—এদিকে এসো।—বলে সে সরে এলো।

—না না, শুধু এলে হবে না, যা কিছু তোমার আছে, পুঁটলি-পোঁটলা সব নিয়ে এসো।

একবার তার মুখের দিকে চেয়ে দামিনী তার কাপড় দু'খানি নিয়ে বেরিয়ে এলো।

চেয়ারের উপর বসে প'ড়ে প্রফুল্ল বললে—ঢেঁকিকে লাথি না মারলে সে কথা শোনে না। দুধ-কলা দিয়ে এতদিন সাপ পুষেছিলাম! —যাও, দরজা খুলে দিয়েছি—সোজা, চলে যাও। চুলের মুঠি ধরে' তোমাকে আমার শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু চোরকে ছুঁতে আমার ঘেন্না করে!—যাও, চলে যাও। ওকি, বসলে যে দেয়ালের ধারে?

আলোটা হাতে করে প্রফুল্ল আবার উঠে এল। পরে বললে—এখন তোমাকে পথ দেখিয়ে দেয়া ছাড়া আমার আর কোনো বিবেচনা নেই। যাও, চলে যাও, দূর হয়ে যাও—কোনোদিন আর এ চোখের সুমুখে এসো না, তা হলে যে অপমানটুকু আজ বাকী রইলো তাও হবে।

ধরা গলায় দামিনী বললে—অন্ধকারে কোথায় যাবো?

চুরি করবার বেলা ত অন্ধকার মনে হয় নি?—ওকি, কান্না হচ্ছে যে ফোঁস্ ফোঁস্ করে! তা হোক—দয়া মায়ার বালাই আমার নেই।

প্রফুল্ল আবার এসে চেয়ারে বসলো। পরে অন্য দিকে চেয়ে বল্‌তে লাগলো—অথচ কি যে চুরি করতে এসেছিলে তা তুমিই জানো। আজ সকালেই ত তোমার কাছে একটা টাকা ধার করে চালিয়েছি কিন্তু তা বললে কি হয়, চোর যারা তারা নিজের স্বভাব ছাড়বে কেন? কই, গেলে না যে এখনো?

দামিনী তবুও বসে রইলো। চোখ দিয়ে তখন তার দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। প্রফুল্ল বললে—মেয়েদের চোখের জল কোনোদিন দেখি নি। কি জানি কেন, তোমার দিকে চেয়ে মনটা নরম হয়ে আসছে। জীবনে তোমার কী সুখ বলতে পারো দামিনী? এক মুঠো ভাতের জন্যে পরের দোরে দোরে চিরদিন ঘুরে বেড়িয়েছো;

মেয়ে হয়ে সংসারী হও নি কোনোদিন ; নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নও,— পরের বস্তুতে লোভ ! দামিনী, কী সুখ তোমার ?

দামিনী কাঠের মতো বসে রইলো ; নিঃশব্দ—নিরুত্তর !

তা সে যাই হোক,—কাল তোমায় যেতেই হবে। কিন্তু মনে রেখো, কাল যাবার সময় তোমার ওই চোখের জল···হ্যাঁ, ও চোখ যেন আর না দেখি,—

জান্‌লার বাইরে স্বচ্ছ অন্ধকারের দিকে চেয়ে হঠাৎ এক সময় একটু হেসে প্রফুল্ল আবার বললে—তোমার কথা ভাবতে গিয়ে, তোমার বিচার কর্ত্তে গিয়ে আমার নিজের কথাও মনে পড়ে' গেল দামিনী। কেবল কি তোমার জীবনেই সুখ নেই ?

অগ্নিশিখা

প্যাসেঞ্জার ট্রেণ সবেমাত্র একটা ষ্টেশন্ ছাড়লো। অত্যন্ত একঘেয়ে তার পথ, পীড়াদায়ক অসহনীয় একঘেয়েমি, গতিটা যেন তার ক্লান্তিতে ভরা। এই নিরুদ্বেগ অবসন্নতা নিয়ে এ গাড়ী যে কেমন করে' কল্‌কাতায় গিয়ে পৌছবে ভাবলে অবাক হতে হয়। মাত্র আশী মাইল রাস্তা, একখানা এত বড় ট্রেণের পক্ষে কিছুই না, কিন্তু পনেরো মাইল পথ পার হতেই একে চারবার থামতে হয়েছে। এমন অনুগত, এমন বাধ্য গাড়ী আর দু'টি নেই। লাল নিশানার হাতছানি কোথাও দেখলেই থামবে। যতক্ষণ চলে তার চেয়ে বেশিক্ষণ থামে, থামতেই তার উৎসাহ।

থামতে তাকে হবেই। প্রখর জ্যৈষ্ঠের রোদ হা হা করে' জ্বল্‌ছে। মাঠ জ্বল্‌ছে, আকাশ জ্বল্‌ছে, হাওয়া জ্বল্‌ছে। না থামলেই তার চলবে না। যাত্রীরা সরবৎ খাবে, জল নেবে, পান কিন্‌বে, নামবে কেউ,

কেউ বা উঠবে—যার এত তাগিদ তার পক্ষে এক দৌড়ে পথ পার হওয়া চলে না। তা ছাড়া 'লাইন্ ক্লিয়ার' তার ভাগ্যে কচিৎ ঘটে, কেউই তাকে অগ্রসর হয়ে যেতে দেয় না, তার আগে চলবার কথা নয়। সংসার-ভারাক্রান্ত দরিদ্র কেরাণীর মতো সে ভীত, সশঙ্কিত। সবাইকে পথ ছেড়ে দিয়ে সকলের পিছনে চলাই তার স্বধর্ম্ম। ডাক গাড়ীর মতো ক্ষাত্রতেজ তার নেই।

গরমে ঘামে আর অবসাদে যাত্রীরাও নেতিয়ে পড়েছে। তারা জানে এক সময় পৌঁছবেই, পৌঁছতে পারলেই তারা খুসি। সন্ধ্যার আগে কিন্তু গাড়ী কল্‌কাতায় পৌঁছবে না। সময়ের সঠিক হিসাব নিয়ে মেয়ে-কাম্‌রায় তুমুল আলোচনা উঠেছে।

নিছক বাঙালী স্ত্রীলোকের মজলিস। নির্ব্বুদ্ধিতা ও গ্রাম্যতায় তারা বাংলার স্ত্রীজাতির হুবহু প্রতিনিধি। যে কয়জন মেয়ে আলোচনায় যোগ দেননি, তাঁরা ওর মধ্যে একটু ভদ্র, একটু ভব্য, খুব সম্ভবত তাঁরা বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত পড়েছেন,—অন্ততঃ তাঁদের চেহারা ও পরিচ্ছদের পালিশ দেখে তাই মনে হয়। যে মেয়েটি এতক্ষণ একান্তে জান্‌লার ধারে বসেছিল, তার সঙ্গে আর সকলের চোখাচোখি হলেও এই মহামূল্য আলোচনায় কেউ তাকে আকর্ষণ করেনি। করবার কথা নয়। তার নির্বোধ চাহনি আলাপে বাধা দিয়েছে। চোখে তার কোনো ভাষা নেই, কৌতূহল নেই। সে ট্রেণে চড়ে' চলছে কিনা, তার কাছাকাছি এতগুলি স্ত্রীলোক আছে কিনা—তার মুখ দেখে কিছু মনে হবার জো নেই। সম্ভবত কানে শুনতে সে পায় না। কিন্তু আশ্চর্য্য তার সাজসজ্জা। গলা থেকে সুরু করে' হাতের কব্জি পর্য্যন্ত জামা আঁটা, তার উপরে কাপড় জড়ানো। এক রাশ মাথার চুল খোলা। চুল সে কোনোদিন যে বাঁধে এমন চিহ্ন মাথার কোথাও নেই। তিনটা ষ্টেশন্ আগে সে গাড়ীতে উঠেছে, সঙ্গে একটা চামড়ার ব্যাগ,—

এতক্ষণ নিঃশব্দে এতটা পথ সে চলে' এসেছে। এই নিঃশব্দতাই যেন তার একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য। বিস্ময়কর তার ঔদাসীন্য।

গরম হাওয়ার জন্য গাড়ীর জান্‌লাগুলি বন্ধ করে' দেওয়া হয়েছিল। ভিতরে কেউ কেউ হাতপাখা চালাচ্ছে। তাদের ভিতর একজন এবার একটু এগিয়ে এল। মেয়েটির দিকে ইঙ্গিত করে' বললে, হ্যাগা বলি অ মেয়ে—

মেয়েটি ফিরে তাকালো। এক প্রৌঢ়া প্রশ্ন করছেন।

তুমি কোন্ ইষ্টিশানে নাম্‌বে গা?

প্রথমটা উত্তর পাওয়া গেল না। আবার প্রশ্ন করায় মেয়েটি বললে, শিয়ালদায়।

ওমা, তবে ত আমাদের সঙ্গেই। ক'টার সময় পৌঁছবে জানো মা?

এবারেও উত্তরটা ছোট! খুব ছোট আর স্পষ্ট; বললে, জানি।

নির্ভুল সময়টা শোনবার জন্য সবাই তার দিকে একযোগে ফিরে তাকালো! কিন্তু আবার সে উধাও হয়ে গেল নিজের প্রকৃতির মধ্যে। তার সঙ্গে কথা কইতে গেলেই যেন তার ঘুম ভাঙাতে হয়। বোঝা যায় না, ঘুমোয় কিম্বা ধ্যান করে, কিম্বা স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার এই নিরাসক্তিতে কয়েকজন মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলো। জানে— এইটুকুই উত্তর, এইটুকুই তাদের শোনবার। এর চেয়ে বেশি তারা জানতে চায়নি, চাইলে হয়ত শুন্‌ত। অথচ মেয়েটির আশ্চর্য্য ধৈর্য্য। এই অসহ্য গরমে তার কোথাও চাঞ্চল্য নেই, প্রশান্ত, অকম্পিত। কপালে ঘাম গড়াচ্ছে, গলার কাছে জামাটা ভিজে উঠেছে,—ভ্রূক্ষেপ নেই। এক গোছা চুল মুখের উপর দিয়ে নেমে এসেছে, গ্রাহ্য করছে না।

একজন বর্ষীয়সী এবার একটু সরে' এলেন। বললেন, চুপ করলে কেন বাছা, ক'টার সময় শ্যালদায় পৌঁছবে বললে না ত?

মেয়েটি আবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। বললে, ছ'টা চব্বিশে।

একেবারে তার কণ্ঠস্থ হিসাব, কাঁটায় কাঁটায়। আবার মুখ চাওয়াচায়ি। ওর বয়সটা কত, কাপড় জামার জটলায় বোঝবার উপায় নেই। কেবলমাত্র মুগ দেখে বাঙালী মেয়ের বয়স বোঝা যায় না। স্বাস্থ্যটা ভাল। হাতের আঙুলে বয়সের চিহ্ন নেই। পায়ে ঘুন্টি বাঁধা শু। মাথার চুলে বয়স নেই। দাঁতগুলি চাপা। পিছন দিকটা আড়াল করা। বয়সটার ইঙ্গিত না পেলে অন্যান্য মেয়েদের মনে স্বস্তি নেই। তারা সবাই আপন আপন বয়সকে স্পষ্ট প্রকাশ করে' বসে রয়েছে। তাদের কাপড় পরা দেখলে নারীর দেহ সম্বন্ধে আর কোনো কৌতূহল থাকে না। আপন আপন দেহের প্রচারকার্য্য করবার জন্য তাহা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সকলের চেয়ে সত্য যে, তারা স্ত্রীলোক।

তোমার সঙ্গে কে আছে, হ্যা গা মেয়ে?

এবার সে তাড়াতাড়ি উত্তর দিল। একটু নড়ে চড়ে বসে' বললে, কেউ নেই।

একলা যাচ্ছ?

হ্যাঁ।

বোঝা গেল না তার এই স্মিত মুখখানা স্বাভাবিক কি না। চোখের তারার ভিতরে তার কোথায় যেন একটি হাসির ছায়া আছে। চাপা ঠোঁটের ভিতরে কি বিদ্রূপ রয়েছে? তার এই স্বাভাবিক বৈরাগ্যের পিছনে কি তাচ্ছিল্য? মেয়েদের ভিতরে দেখতে দেখতে অবারণ ও কৌতূহল কানাকানি চলতে লাগলো। তাদের সব আলোচনা ও সমালোচনা একটি কেন্দ্রে এসে দাঁড়ালো।

গাড়ী কখন্ থামছে আর কতক্ষণই বা চলছে কে জানে। থামবার সময় বাঁশী বাজে, চলবার সময় নয়। তিন মাইলের পরেই তাকে দীর্ঘ

নিঃশ্বাস ফেলে দাঁড়াতে হয়। এমন ভদ্র এবং বিনয়ী ট্রেণ আর কোনো লাইনে চলে না। বাঙালী মেয়ের চরিত্রের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়েছে।

তোমার নাম কি মা ?

নূতন প্রশ্নে মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে তাকালো। সে যেন অগাধ চিন্তায় পড়েছে, চোখে মুখে তার কূল-কিনারা নেই। নির্ব্বোধ, সত্যি সে নির্ব্বোধ, নিজের নামটা পর্য্যন্ত সে মুখস্থ রাখেনি, নিজের নামটা প্রকাশ করতে তার লজ্জা। মুখের উপর থেকে সে চুলের গোছা সরালো, সজাগ হয়ে তাকালো, সচকিত হয়ে বসলো। বললে, আমার নাম সুশীলা।

সুশীলাই বটে। শান্তি, নমিতা, অমিতা, কমলা এবং ওই জাতের নামগুলোও তার গায়ে জুড়ে দেওয়া চলে। অবলা হ'লে আরো ভালো। তাদের শিথিল ক্ষীণাঙ্গের দৌর্ব্বল্যের মতোই তাদের নামগুলো এলিয়ে-পড়া। সুশীলা শুনে সবাই আশ্বস্ত হোলো। যাক এ মেয়ে তাদেরই দলে। নিশ্চয়ই কোনো গণ্ডগ্রামের মেয়ে। কোনো অপোগণ্ড গণ্ডগ্রাম। সুশীলাকে ঘিরে সবাই বসলো, সে যেন তাদের আত্মীয়, ঘনিষ্ঠ, বহুপরিচিত। সুশীলা ? বাঁচা গেল। তাদের মধ্যেও একজন সুশীলা আছে। ওই নেপুর মা, ওর পোষাকী নাম সুশীলা, ছেলেপুলে হবার পর থেকে ওকে নাম ধরে' অবশ্য আর কেউ ডাকে না। যাক্ তাদের সব কৌতূহল মিটলো। লক্ষ লক্ষ সুশীলার এও একজন।

হা গা সুশীলা, একলা যাচ্ছ কলকাতায়, মেয়েমানুষ, সাওস ত তোমার কম নয় মা ? কে আছে সেখানে ?

সুশীলা এবার প্রশ্নকর্ত্রীর প্রাঞ্জল ভাষা শুনে হাসলো। খুব সম্ভব এবার সে একটু সহজ হতে পেরেছে। আঘাত না করলে বৈরাগ্যের খোলস খসে না। বললে, সবাই আছে।

তবে একলা যাচ্ছ কেন?

একলা ত নয়, আপনারা রয়েছেন।

অদ্ভুত উত্তর বটে। স্পষ্ট ধারালো। প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটির মুখ দিয়ে আর কথা ফুটলো না। অল্পবয়স্কা একটি স্ত্রীলোক এবার বললে, অত জামা পরেছ গরম লাগছে না?

লাগছে বৈকি।

তবে বোতামগুলো খুলে দিলেই ত হয়।

সুশীলা হঠাৎ হাত দিয়ে নিজের জামাটা চেপে ধরলো, তারপর গলা নামিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, না, ভেতরে সেমিজ নেই।

তার লজ্জা দেখে ত ওরা অবাক। এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। মেয়েদের মধ্যে না হয় কিছু জানাজানিই হবে। মেয়েদের কাছেও যে মেয়ের লজ্জা, বিয়ে হ'লে 'তার উপায়? এই সব মেয়েরই 'হুড়কো' হয়।

তোমার বে হয়নি?

সুশীলা হাসলো। ততক্ষণে দুটি মেয়ে তার একটু অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। একটি মেয়ে উঠে এসে তার গা ঘেঁসে বসলো। অন্যটি বিবাহিতা। সেটি সুশীলার জামার হাতার বোতাম খুলতে খুলতে বললে, অত লজ্জা করে না, হাত দুটোয় তোমার ভাই একটু হাওয়া লাগুক, ঘেমে যে নেয়ে উঠেছ!

অপ্রত্যাশিত স্নেহ, অনাহূত আত্মীয়তা, অস্বীকার করবার আর পথ নেই। ছোঁয়াছুঁয়ি না হ'লে মেয়েদের বন্ধুত্ব তৃপ্তি পায় না, মাটির মতো কণায় কণায় লেগে থাকা তাদের প্রকৃতি। কুমারী মেয়েটি উঠে সুশীলার চুল ফিরিয়ে বেঁধে দিতে লাগলো।—ওমা, তোমার হাতে চুড়ি কই ভাই? কিছু নেই যে।

যেন অলঙ্কার না থাকলে স্ত্রীলোক ব'লে প্রমাণ হয় না। কিন্তু

তার কথায় সবাই চকিত হ'য়ে উঠ্‌লো। চক্ষের নিমেষে দেখা গেল সুশীলার সর্ব্বাঙ্গে কোথাও আভরণের চিহ্নমাত্র নেই। নাক কান গলা হাত সব খালি। বিস্ময়ের কথাই বটে। রহস্যটা এতক্ষণে উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে গেল।

নেপুর মা বললেন, আহা তাই ত বলি, মুখ ফুটে মেয়ে কথা বলে না কেন। বাছা রে, এইটুকু বয়সে—কপাল পুড়েছে কদ্দিন মা?

সুশীলা কপালে একবারটী হাত বুলোল। তারপরেই মনে পড়লো, প্রশ্নটা কপালের প্রতি নয়, ভাগ্যের প্রতি। কুমারী মেয়েটি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে সমস্ত গাড়ীর সকল স্ত্রীযাত্রীর নিকট থেকে অজস্র স্নেহ ও সহানুভূতি অবিরত বর্ষিত হ'তে লাগলো। মাথায় এয়োতির চিহ্ন না দেখে প্রথমেই যিনি নাকি সন্দেহ করেছিলেন তিনি তাঁর সুদূর অতীত জীবনকে স্মরণ করে' অশ্রু পর্য্যন্ত মুছলেন। তারপর কানাকানি আর জটলা আর আন্দোলন। তার-পর চলতে লাগলো কত বিধবা হওয়ার গল্প। অল্পবয়সে বিধবা হবার বিপদটাই ওরা জানে, আনন্দটা জানে না।—কত দিন স্বামী গেছে মা?

কৌতুকে সুশীলার চোখ নেচে উঠ্‌লো, মন ভরে' উঠ্‌লো। বললে, তা কি আর মনে আছে!

আহা, মরে যাই, মনে থাকবার কি কথা? সেই এতটুকু বয়েস ·· কচি মেয়ে—এমন সমাজের মুখে ছাই!

যে দুটি মেয়ে অন্তরঙ্গ তারা বসলো কাছাকাছি। যেটুকু যত্ন ও যেটুকু মমতা তারা ইতিমধ্যে প্রকাশ করে' ফেলেছে তার জন্য তারা লজ্জিত,—এগুলি কী অকিঞ্চিৎকর! স্বামীহীনা যারা, নিজেদের কাছেও তাদের মূল্য নেই! তুচ্ছ প্রসাধন, তুচ্ছ আভরণ। আগেকার সতীদাহ বের ভালো ছিল, সেই প্রথা উঠে গিয়েই ত মেয়েদের এত দুঃখ। সতী বটে তা'রা।

বউটি চুপি চুপি বললে, সত্যি তোমার মনে নেই তাঁকে ?

কা'কে

আহা, এ বুঝি ঠাট্টার কথা ? তোমার স্বামীর কথা হচ্ছে।

সুশীলা হেসে বললে, ও, তার কথা। মনে রেখে কী হবে? আমার মনে অত জায়গা নেই।

ওকি কথা ভাই, পাপ হবে যে।

তা বটে, এ কথাটা সুশীলার মনে ছিল না। কে জানে, পাপ এত সহজ হয়! এদেশে পায়ে পায়ে পাপ। ওদিকে যাঁরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলেন, তাঁদের একজন বললেন, কি জাত মা তোমার ?

সুশীলা বললে, হিন্দু।

তা ত জানি। বলি, বাউন না কায়েত ?

ব্রাহ্মণ।

তবে ত একাদশীও করতে হয়। আহা, অতটুকু মেয়ে— একবেলাই ত হাত-মুখের কাজ ? তা ত বটেই, বাউনের ঘর, দুবেলা খাওয়া ত আর চলে না।

সুশীলা বললে, কোনো কোনোদিন একবেলাও খাইনে।

আহা, খাওয়া যে ভগবান উঠিয়ে দেছে মা। পোড়া কপাল আমাদের। ইনি গেছেন আজ চল্লিশ বছর, কাঁচকলা আর অড়রডাল খেয়ে হাড়ে ঘুণ ধরলো। বিয়ে পৈতেয় মুখ দেখাবার হুকুম ছিল না। তুমি মা এবার থেকে একখানি চাদর জড়িয়ো বাছা। বিধবা মানুষ গায়ে ত জামা দিতে নেই

সঙ্গিনী দুটির সঙ্গে চোখচোখি করে' সুশীলা হাসিমুখে বললে, জামা গায়ে দিলে বুঝি পাপ হয় ?

তারা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। সুশীলা বিস্ফারিত চোখে

চেয়ে বললে, স্বামী মরবার পর গা খুলে বেড়াতে হবে? তিনি ছাড়া কি দেশে আর পুরুষ নেই?

বউটি তার স্পষ্টবাদিতায় শঙ্কিত চোখে তাকালো, চোখ-ইসারায় কুমারী মেয়েটিকে সরে' যেতে বললে। এই মেয়েটির ভিতরে কোথায় যেন একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লুক্কায়িত আছে, হঠাৎ গৃহস্থ বধূর কাপড়ে চোপড়ে আগুন ধরে' যাবার ভয় রয়েছে। তার কাছ থেকে দূরে থাকাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়।

গাড়ীখানা যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে, পৌছবার নামটি নেই। পশ্চিম দিকে রোদ নেমেছে। বেলা অপরাহ্ণ। সময়টা সুশীলার মন্দ কাটলো না। এমন সঙ্গিনী পেলে দিনরাত সে ট্রেণে ভ্রমণ করতে পারে। ভাগ্যি বিধবা বলে' সবাই তাকে জান্‌লো নৈলে এই আনন্দটুকু থেকে তাকে বঞ্চিত থাকতে হোতো। আর তার কোনো সঙ্কোচ নেই, বাধা নেই, সে খুসি হয়ে উঠেছে!

বয়স্কা স্ত্রীলোকদের কৌতূহল মিটে গেছে, তাদের জানা হয়ে গেছে, চিনে নিয়েছে তারা সুশীলাকে, আর কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো আগ্রহ নেই। তাদের আগ্রহ দুর্ভাগ্যের সংবাদটি শোনা পর্য্যন্ত – ব্যস্‌, ওজন করা একটু সহানুভূতি প্রকাশ করে'ই তারা কাজ সারলো। সুশীলা সব চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লো, দেখ্‌লো তাদের চেহারার দ্রুত পরিবর্ত্তন। তারা আর বন্ধু নয়, সঙ্গিনী নয়, তারা কেবল মাত্র সহযাত্রী, তাদের আগ্রহ আর কৌতূহল ফুরিয়ে গেছে। তাদের সকলের সঙ্গে সুশীলার জীবন কোথাও না কোথাও মিলেছে, এতেই তারা পরিতৃপ্ত। সুশীলার আর কোনো বৈচিত্র্য নেই, আর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, জলের মতো সে স্বচ্ছ, শাদা কাগজের মতো সে সুস্পষ্ট।

কিন্তু বউটির মনে যেন স্বস্তি নেই, মাঝে মাঝে সে উসখুস করে'

উঠ্‌ছে। বার্‌ বার এড়াতে গিয়েও সে মায়া ছাড়তে পারছে না। এক সময় বল্‌লে, বাড়ীতে তোমাকে থান্‌ কাপড় পরতে বলে না ?

সুশীলা হেসে বল্‌লে, বললেই কি পরতে হবে ?

নিয়ম কিনা তাই বলছি।

ওপাশের বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকটি কান পেতে এদের কথা শুনছিল। এবার বললে, তা ত বটেই মা, এ যে নিয়ম। নিয়মের ওপরেই ত সব। তুমি মা জুতোটা পায়ে দিয়ে ভাল করনি।

সুশীলা বল্‌লে, হাঁটতে পারিনে শুধু পায়ে।

ওমা, তা বললে কি হয়। জুতোই যদি পায়ে ওঠে তবে আর বাকি কি থাকে মা ? সোয়ামী যার অকালে মরে তার শরীরে যত্ন··· শাস্তরটা মান্‌তে হবে ত !

শাস্ত্রের পরে আর কথা চলে না। সুশীলা নাস্তিক নয়। সবিনয় শ্রদ্ধায় সে চুপ করে' রইল। মনে হোলো আজ থেকে সে জুতো পরা একেবারে ত্যাগ করবে।

এবার বউটি চুপি চুপি বললে, তোমার স্বামী কিসে মারা গিছলেন ?

সুশীলা এদিক ওদিক তাকালো। সকলকেই সে লক্ষ্য করলো। তাকালো বাইরের দিকে, চলন্ত ট্রেণের কাম্‌রাটা সে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করলো। তারপর হঠাৎ নিশ্বাস ফেলে বললে, ওঃ সে অনেক বড় গল্প।

বউটির চোখে মুখে কৌতূহল জল্‌ জল করতে লাগলো। কুমারী মেয়েটি আবার কাছে ঘেঁসে এল। মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলে আপনার ছেলেপুলে হয়নি ?

সুশীলার মুখ রাঙা হয়ে উঠ্‌লো। অনাবশ্যক, নিতান্ত অনাবশ্যক প্রশ্ন। কাঁটায় কাঁটায় ইতিমধ্যে সে যেন ক্ষত বিক্ষত হয়ে উঠেছে।

অসহ্য গরম, অসহনীয় সংসর্গ। এরা তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পরীক্ষা করছে, তাকে তলিয়ে বিশ্লেষণ করছে, তার লজ্জাকে পর্য্যন্ত হরণ করতে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু রাগ করা চলবে না। হাসিমুখে কোমল কণ্ঠে সে কুমারী মেয়েটির মুখের উপর বললে, সন্তানের জন্মদান করবার আগেই তিনি মারা গেছেন।

দ্রুত, নিষ্ঠুর উত্তর। ছুরির মতো তীক্ষ্ণ, বিষাক্ত। ওরা স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে গেল।...তারপর সুশীলা হাসলো। হেসে বললে, মৃত্যুর গল্পটা শুনতে চান্?

বউটি ভয়ে ভয়ে বললে, শুন্‌তে ইচ্ছা করে।

ওঃ! সে কথা ভাবলে আজো গায়ে কাঁটা দেয়। একদিন দু'জনে নৌকায় চড়ে এক ছোট নদীর ভেতর দিয়ে যাচ্ছি—

কোথায়?

তাঁর পাখী শিকার করার সখ ছিল। হ্যাঁ, নদীর দু'ধারে গভীর বন, কত জন্তুর কত রকম আওয়াজ,—নৌকোর মধ্যে আমি আর তিনি। তখন বসন্ত কাল—

কুমারী মেয়েটির চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠ্‌লো, জীবনের দুর্ব্বার নেশা তার চোখে ঝলমল করছে। সুশীলা হেসে বললে,—চোখে তার স্বপ্নের নিবিড় মদিরতা,—বললে, দেখতে দেখতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল, নদীর পার দেখা যায় না, আকাশে ঝড়ের লক্ষণ,—তীরে নৌকা ভেড়াতে হোলো। কী অন্ধকার! কাছাকাছি গ্রাম আছে কিনা জানবার জন্য দু'জনে বনের পথে যাচ্ছি এমন সময় বিদ্যুৎ চম্‌কাল—ওমা, দেখি বিরাট পাহাড়ের গায়ে আমরা দাঁড়িয়ে—

তারপর—? বউটি বললে।

তারপর উনি হঠাৎ বললেন, কিসের যেন বোট্‌কা গন্ধ! এদিক ওদিক ফিরে দেখি, খুব কাছে পাশাপাশি দুটো আলো জ্বলছে।

আলো? এগিয়ে যেতেই আঁৎকে উঠলুম। আলো নয়, একটা জানোয়ারের চোখ! তাঁর হাতের বন্দুক পড়ে গেল। ভগবানকে ডাকার কথা ভুলে গেলুম। হ্যাঁ, আমি পালাতে পেরেছিলুম, তাঁর শেষ গলার আওয়াজটা শুন্‌তে শুন্‌তে। তারপর আমাকেও কে যেন তাড়া করলো, পাগলের মতো ছুটলুম, জঙ্গলের টানাটানিতে কাপড় চোপড় সব খুলে পড়ে গিয়েছিল। ছুটছি, ছুটছি।—এলুম নদীর ধারে। কে যেন দাঁড়িয়ে। মানুষ, না জানোয়ার? বিদ্যুতের আলোয় দেখি মানুষও নয়, জানোয়ারও নয়, একটা চলন্ত ছায়া—ঝাঁপ দিয়ে পড়লুম নদীতে—

গল্পের মাঝখানে অকস্মাৎ ট্রেণখানা থামলো। শিয়ালদা ষ্টেশন্ এসে পড়েছে। সন্ধ্যার আলো জ্বলেছে চারিদিকে। নানা-কণ্ঠের আওয়াজ, ইঞ্জিনের নিঃশ্বাস, কুলির চীৎকার। লটবহর নিয়ে সবাই নামছে গাড়ী থেকে। মেয়েদের নামিয়ে নিতে পুরুষরা এসে দাঁড়িয়েছে দরজার গোড়ায়।

হঠাৎ তাদের ভিতর একজনকে লক্ষ্য করে'ই সুশীলা ধড়মড় করে' উঠে দাঁড়ালো। উচ্ছ্বসিত উল্লাসে হেসে চীৎকার করে' বললে, এসেছ? চিঠি পেয়েছিলে ঠিক সময়ে?

চঞ্চল, উদ্দাম, অসংযত। চোখে ও মুখে তার ঝড়ের দ্রুততা। ছোট স্যুটকেশটা তাকে তাড়াতাড়ি হাতে নিতে দেখে বউটি বললে ও কে ভাই তোমার?

আমার স্বামী।

স্বামী? স্বামী? বিধবা বল্‌লে যে?

দ্রুতপদে গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে সুশীলা ঠোঁট উল্‌টে হেসে বললে, আমার এখনো বিয়েই হয়নি। বলে' সে একটি সুশ্রী যুবকের হাত ধ'রে ষ্টেশনের ভিড়ের মধ্যে চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।